بسم الله، والحمْد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمّدٍ، وآلِه وصحبه ومن آمن به واهتدى بهداه ... وبعد

[বিষয় : জিহাদে সামরিক কৌশলের গুরুত্ব]

বাস্তবতা ১ জিহাদের দাওয়াহর প্রায় ৯৫ % জুড়ে থাকে ‘কেন জিহাদ’ – এ নিয়ে আলোচনা। ‘কীভাবে জিহাদ’ – এ নিয়ে আলোচনা হয় বাকি ৫ % এ। সংখ্যাটা ৫ -এর চাইতে আরো ছোটও হতে পারে। সুতরাং জিহাদ সংক্রান্ত অধিকাংশ লেখা, বক্তব্য, ভিডিও ইত্যাদি থেকে ‘কেন জিহাদ করতে হবে’ – এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা পেলেও, কীভাবে জিহাদ করতে হবে এ নিয়ে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

আর এর পেছনে শক্ত কারনও আছে। উম্মাহর মূল সমস্যা হল তারা বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা, দুনিয়ার ভালোবাসা, মৃত্যুকে অপছন্দ করা – ইত্যাদি কারনে বিশুদ্ধ তাওহিদ সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ অবস্থায় আছে। তাওয়াগিতের পরিচয় ও তাদের বর্জন করার ব্যাপারে বেখেয়াল হয়েছে। আল ওয়ালা ওয়াল বারা বিস্মৃত হয়েছে। ফরয দায়িত্ব জিহাদ থেকে দূরে সরে আছে। তাই যারা বিশ্বজুড়ে জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মূল ফোকাস থাকে ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগাবার। এছাড়া “কীভাবে জিহাদ’ – এ আলোচনার মধ্যে রণকৌশল, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পলিসি , স্ট্র্যাটিজি (strategy), ট্যাকটিক (tactics) ইত্যাদি বিষয় থাকে। যদি এধরণের বিষয় পাবলিকলি আলোচনা করা হয়, গণমানুষের সামনে প্রকাশ করা হয় তাহলে সেটা মুজাহিদিনকে কৌশলগতভাবে ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যায়। কারন মুরতাদ তাওাগীত ও কুফফারের সামনেও বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়ে যায়।

একইসাথে, এও সত্য যে স্ট্র্যাটিজিক ও ট্যাকটিকাল বিষয়ে আলোচনা প্রত্যেক জিহাদ সমর্থক বা জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তির জন্য মানানসই না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ বিষয়গুলো জানানোও আবশ্যক না। সর্বোপরি, জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত – এ সত্য উপস্থাপনের পর একজন মুমিনের প্রথম দায়িত্ব হল সে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া। আর যেহেতু জিহাদ একটি জামাতবদ্ধ ইবাদত তাই ব্যক্তির উপর আবশ্যক হল জামাতবদ্ধ হওয়া। কারন যা কিছু আবশ্যককে অর্জনের জন্য প্রয়োজন তার সবকিছুই আবশ্যকে পরিণত হয়। আর যখন ব্যক্তিই জামাতবদ্ধ হয়, তখন জামা’আহ তাকে দিকনির্দেশনা দিতে থাকে ও দায়িত্ব বন্টন করে। তাই জিহাদি আন্দোলনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে, জনসাধারনকে আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে, ‘জিহাদ কীভাবে?’ – প্রাথমিক পর্যায়ে এ আলোচনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয় না।

তবে অনস্বীকার্য সত্য হল, কোন দল বা আন্দোলনের কাজ, কাজের প্রকৃতি, চিন্তাধারা, আদর্শ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, নীতিমালা, আক্বিদা, সিলেবাস, পলিসি – ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে কর্মীদের পক্ষে সম্ভব না কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার। এও অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র পাবলিকলি যেসব মিডিয়া রিলিজ (বই, রিসালাহ, বয়ান, ভিডিও) পাওয়া যায় তার মাধ্যমে এসবগুলো বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব না। তবে আলহামদুলিল্লাহ গত বেশ কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক মুজাহিদিন মিডিয়াগুলো এবং, বাংলাভাষার মিডিয়াগুলোতে ধীরগতিতে হলেও এসব বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা উঠে আসছে। এজন্য জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকল ভাই এবং সকল সমর্থক ভাইদের উচিৎ জিহাদি মিডিয়ার রিলিজসমূহ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল থাকা, বিশেষ মুজাহিদিন উলামা ও উমারাহর কিতাব, রিসালাহ ও বয়ানগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পড়া ও এ নিয়ে চিন্তা করা।
এ দীর্ঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য কী?
উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশে এবং উপমহাদেশে জিহাদের ব্যাপারে মুজাহিদিনের ভূমিকা কী হবে? – এ প্রশ্নের ব্যাপারে আমাদের চিন্তাকে পরিকপক্ক ও স্বচ্ছ করার গুরুত্ব সম্পর্কে ভাইদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কারন জিহাদের ক্ষেত্রে জযবা যেমন থাকা প্রয়োজন তেমনিভাবে উপযুক্ত সময়ে জিহাদি আন্দোলনের প্রয়োজনেই সেই জযবাকে কন্ট্রোল করারও প্রবণতা প্রয়োজন। দলীল-আদিল্লা জানা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আসলিহাত ও এর ব্যবহারিক জ্ঞান। ব্যবসা হালাল না হারাম হচ্ছে – তা জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে জানা প্রয়োজন ব্যবসা কতোটুক লাভজনক হচ্ছে। বাস্তবতাঃ(২) বিভিন্ন কারনে এ ভূমিতে জিহাদি আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে, এবং আন্দোলনের পক্ষে দাওয়াত দানকারী, এমনকি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের মধ্যেও উপরে আলোচিত বিষয়ের বেশ কিছুর ব্যাপারে সঠিক বা যথেষ্ট ধারণা নেই। সব ব্যক্তির সব ব্যাপারে ধারণা থাকা অপরিহার্যও না। তবে নিজেদের অজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত থাকা এবং প্রয়োজনের নতুন কিছু শেখার জন্য ইতিবাচক মনোভাব সবার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। তিনি যে দলেরই হোন না কেন। এক্ষেত্রে কে কতোদিন ধরে কাজের সাথে যুক্ত আছে, কে কার আগে কাজ শুরু করেছে, সাধারন মানুষের কাছে কার মর্যাদা বা অবস্থান কতোটুকু – ইত্যাদি বিষয় প্রাসঙ্গিক না। বরং এসব বিষয় নিয়ে অধিক চিন্তা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাড়ায়।
একথাগুলো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য , তেমনিভাবে সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।

উপরোক্ত বাস্তবতাগুলোর বিবেচনায় আমরা চেষ্টা করবো নিজ তুচ্ছ সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকল ভাই ও সমর্থকদের জন্য উল্লেখিত এমন সব বিষয়ে কিছু বিষয় পরিষ্কার করা যেগুলো সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারায় পরিপক্কতা ও স্বচ্ছতা আসা দরকার, বিইযনিল্লাহ। ইনশা আল্লাহ এর মধ্যে মুজাহিদিনের কল্যাণ নিহিত আছে। কারন যতোক্ষন নিজ দায়িত্ব, উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে কেউ পূর্ণ সচেতন হয় না, ততোক্ষণ তার পক্ষে যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না।
আল্লাহ সহজ করুন। ওয়ামা তাওফিক্বি ইল্লাহ বিল্লাহ।
আমরামূল আলোচনায় যাচ্ছি ইংশাআল্লাহ্‌ ।
(১) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ভূমিঃ
জিহাদ কোথায় হবে ? কীভাবে হবে ?
এখানে যে বিশ্লেষন তুলে ধরা হচ্ছে তা কোন শার’ঈ ফতোয়া না। বরং ময়দানের বাস্তবতার আলোকে কিছু মুজাহিদিন উমারাহর ইজতিহাদ, এবং ক্বাইদাতুল জিহাদের মত। এক্ষেত্রে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতেই পারেন। তবে গেরিলা যুদ্ধ, রাজনীতি ও ময়দানের বাস্তবতার সাথে ওয়াকিবহাল না, দীর্ঘদিন জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়নি এমন কারো কথা স্বভাবতই তেমন গুরুত্ব পাবার যোগ্য না। যাদের জিহাদের ব্যাপারে জ্ঞান হল ঘরে বসে বই/আর্টিকেল পড়া, ভিডিও দেখা, কিংবা দাওয়াতি কাজ করা, কিংবা বাংলাদেশে কিছু অপারেশন করা, তাদের কথা শায়খ উসামা, শায়খ আইমান, শায়খ আবু বাকর নাজি, শায়খ আবু মুসাব আস-সুরি, শায়খ সাইফ আল-আদল, শায়খ আবু ফিরাস আস-সুরিসহ অন্যান্যদের কথার সামনে তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতা রাখে না। এটা শায়খদের সম্মান ও ব্যক্তিপরিচয়ের কারনে না। তাদের দীর্ঘদিনের, একাধিক ময়দানের, একাধিক তানজীমের, একাধিক যুদ্ধের, একাধিক মডেলে কাজ করার অভিজ্ঞতার কারনে। যে জানে আর যে জানে না, সে সমান না।
মূল আলোচনায় যাবার আগে ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিনের রাহিমাহুল্লাহ একটি উক্তি মনে করিয়ে দিচ্ছি। এই উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ, কারন এতে এমন এক বাস্তবতা ফুটে উঠেছে যা অনুধাবন করা ছাড়া সমস্যার সমাধান কিংবা লক্ষ্য অর্জন সম্ভব না
–

“সম্ভবত এর আগেও আমি এ বিষয়ে কথা বলেছি। বর্তমানে আমাদের শত্রুদের তুলনা হল একটি বিষাক্ত গাছের ন্যায়। ধরা যাক, এই গাছের কান্ডের পুরুত্ব হল ৫০ সেমি। গাছটির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও পুরুত্বের অনেক ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা আছে।
গাছটির কান্ড হল আম্রিকা। আর ন্যাটোর সদস্য অন্যান্য দেশগুলো, আরব শাসকগোষ্ঠী, ইত্যাদি হল গাছটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। আর আমাদের (মুজাহিদিন) তুলনা হল, সে ব্যক্তির মতো যে এই

গাছ কেটে ফেলতে চায়। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং উপকরণ সীমিত। তাই আমরা দ্রুত এ কাজটি (গাছ কেটে ফেলা) করতে সক্ষম নই।
আমাদের একমাত্র উপায় হল, ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি করাতের মাধ্যমে এই গাছে কান্ডটিকে কেটে ফেলা। আমাদের লক্ষ্য হল, এই গাছের কান্ড কেটে ফেলা, এবং গাছটি ভূপাতিত হবার আগে না থামা।
ধরুন, আমরা গাছে কান্ডের ৩০ সেমির মতো কেটে ফেলেছি। এখন, আমরা একটা সু্যোগ পেলাম গাছে কোন একটি ডাল, যেমন ব্রিটেন; সম্পূর্ণ ভাবে কেটে ফেলার। এক্ষেত্রে আমাদের উচিৎ হবে এই সু্যোগ উপেক্ষা করে, কান্ড সম্পূর্ণভাবে কাঁটার কাজে মনোনিবেশ করা। যদি আমরা এই ডাল, কিংবা সেই ডাল কাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরি, তাহলে আমরা কখনোই আমাদের মূল কাজ (কান্ড কেটে কুফরের গাছকে ভূপাতিত করা) সম্পন্ন করতে পারবো না। এভাবে আমাদের কাজের গতিও বাধাপ্রাপ্ত হবে, এবং আরো গুরুতর ব্যাপার হল, আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।
গাছ ভূপাতিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমরা কান্ড কাটার কাজ চালিয়ে যাবো। ইন শা আল্লাহ্*, গাছ ভূপাতিত হবার পর, শাখাগুলো আপনাআপনিই মারা যাবে।”
-আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস থেকে গৃহীত
এই উক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাস্তবতা উঠে এসেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল –
১) আমাদের ও শত্রুর মধ্যে শক্তির ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা রয়েছে
২) অর্থস্বল্পতা
৩) পর্যাপ্ত উপযুক্ত জনবলের অভাব
এক কথায় যদি আমরা শাইখের এ উক্তিতে ফুটে ওঠা বাস্তবতার সারমর্ম তুলে ধরতে চাই তবে বলা যায় –
আমরা সীমিত সামর্থ্য দিয়ে অত্যন্ত দামি একটি পণ্য কেনার চেষ্টা করছি।
এই মূহুর্তে আমাদের আছে যতটুক সীমিত সামর্থ্য আছে তা দিয়ে এই পণ্য কেনা সম্ভব না। তাহলে কী করণীয়?
ধরুন আপনার কাছে ১,০০০ টাকা আছে। আপনি ১০ কোটি টাকা দামের কোন হীরার টুকরো কিনতে চাচ্ছেন। আপনি কী করবেন? যদি আপনি দৃঢ় সঙ্কল্প হন তাহলে আপনি আপনার এই ১,০০০ টাকাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে ১০ কোটিতে পৌছানোর চেষ্টা করবেন। আপনি আপনার এই ১,০০০ টাকা বিভিন্ন ব্যবসায় খাটাবেন। তা থেকে লাভ অর্জন করবেন, আবার খাটাবেন, এবং এভাবে আস্তে আস্তে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগোতে থাকবেন।

স্বাভাবিকভাবেই তাহলে উপসংহার টানা যায় যে, আমাদের সীমিত সামর্থ্য আমরা কোথায় কোথায় ব্যয় করবো তা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চিন্তার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। যদি হেলাফেলা করে, কিংবা আবেগের বশবর্তী হয়ে আমরা সব সম্বল আগেই খরচ করে ফেলি তাহলে প্রকৃত প্রয়োজন পূর্ণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি আপনি যাচাইবাছাই না করে, বাজারের অবস্থা না বুঝে, নিছক ভালোলাগা, আবেগ কিংবা কারো কথায় কান দিয়ে আশেপাশের সব ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে ফেলেন, তাহলে আপনার পথে বসার সম্ভাবনা বেশ প্রকট।
জিহাদি আন্দোলনের ক্ষেত্রে, প্রায়োগিকভাবে এই কথার অর্থ হল – জিহাদি তানজিমগুলো কীভাবে ও কোথায়, কোন মাত্রায় জনবল, অর্থ ও অস্ত্র ব্যয় করবে সেটা সঠিকভাবে নির্ধারন করা আবশ্যক। যদি জিহাদি আন্দোলন এটা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তা চরম মাত্রার ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসবে। যেহেতু এই আন্দোলনের সামর্থ্য সীমিত।
এই ক্ষেত্রে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিব্বীর রাহিমাহুল্লাহ একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই –
“জিহাদ করা হল নতুন ব্যবসা শুরু করার মতো। আর আল্লাহ জিহাদকে ব্যবসাই বলেছেন। ব্যবসার শুরু করার আগে আপনাকে বেশ কিছু বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। আপনি কিন্তু শুধু ব্যবসাটা হালাল হচ্ছে নাকি এটাই দেখবেন না। এটা হল শার’ঈ অংশ। কিন্তু আপনাকে আরো কাজ করতে হবে। বাজার নিয়ে গবেষণা করতে হবে যাতে করে আপনার জিনিসের চাহিদা আছে কি না এটা বুঝতে পারেন। কারন যদিও আপনার মূল লক্ষ্য আল্লাহকে খুশি করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, কিন্তু পাশাপাশি জীবিকা অর্জন করাও আপনার লক্ষ্য।
তাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে, কিভাবে লাভ করা যাবে। আপনার চিন্তা করতে হবে কোন জায়গায় দোকান দিলে সেটা লাভজনক হবে। চিন্তা করতে হবে কারা আপনার মূল ক্রেতা হবে, তাদের কাছে কিভাবে আপনার পণ্যকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিভাবে মার্কেটিং করতে হবে, মালামাল পৌছাতে হবে। এ বিষয়গুলো আপনি এড়াতে পারবেন না। শুধুমাত্র পণ্য হালাল হওয়াই প্রফিট করার জন্য যথেষ্ট না।
এ একই কথা খাটে জিহাদের ক্ষেত্রে। আপনাকে শুধুমাত্র শার’ঈ দিকটা দেখলে হবে না। কারন আপনি দুটো লক্ষ্যের মধ্যে যেকোন একটা চাচ্ছেন। আপনার একটি লক্ষ্য হল শাহাদাহ অথবা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা। পাশাপাশি আপনার লক্ষ্য হল মুসলিম উম্মাহকে অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ এ দুটো উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে। আর তাই আপনাকে সামরিক সক্ষমতা, জনবল, বাজেট, স্ট্র্যাটিজি, রণকৌশল, কোন শত্রুর উপর আঘাত হানা অগ্রাধিকার পাবে – এ সব কিছুই চিন্তা করতে হবে।

অর্থাৎ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। কেন খিলাফতের পতন ঘটলো? বর্তমানে উম্মাহর রাজনৈতিক অবস্থা কী? আমাদের দুর্বলতার কারন কী? আমরা কী কী অসুবিধায় ভুগছি? আমাদের পথে মূল বাধা কী? আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি কী? আমাদের শত্রুদের মূল শক্তি কী? তাদের বৈশিষ্ট্য কী? আর এ সব কিছুর আলোকে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাধিক উপযুক্ত ও বাস্তবসম্মত স্ট্র্যাটিজি কী?
এসব কিছু চিন্তা করেই আপনাকে অগ্রসর হতে হবে। কারন জিহাদ একটা নতুন ব্যবসা শুরু করার মতো।”
শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি রাহিমাহুল্লাহ [আস সাহাব মিডিয়া] যদি শায়খের চমৎকার এই উদাহরন আমরা বুঝি তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন হল – জিহাদি আন্দোলন ঠিক কোন কোন ব্যবসায় তার সীমিত পুঁজি খাটাবে? আর এক্ষেত্রে এক-একটি অঞ্চল বা দেশ-ভূমি হবে এক-একটি ব্যবসা।
প্রাথমিক পর্যায়ে – অর্থাৎ অঞ্চলভিত্তিক জিহাদি আদর্শের তানজিমের পর্যায়ে, এ বিষয়ে সুক্ষ আলোচনা অনুপস্থিত ছিল বলা যায়। সব তানজিম নিজ নিজ অঞ্চলে ময়দান কায়েম করা, ক্বিতাল করা, তাগুতকে উচ্ছেদ করাকে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারন করেছিল। মিশরের জামাতুল জিহাদ ও জামা’আহ ইসলামিয়্যাহ, লিবিয়ার আল জামা’আহ ইসলামিয়্যাহ আল মুক্বাতিলা বি লিবিয়া, ফিলিস্তিনের বিভিন্ন দল, সিরিয়ার আল তা’লিয়াহ আল-মুক্বাতিলা, প্রথম আফগান জিহাদ কেন্দ্রিক দল, কাশ্মীরের বিভিন্ন তানজিম এইভাবে অগ্রসর হয়েছিল। মজার ব্যপার হল প্রত্যেক এমন তানজিম নিজেদের কাজকেই, নিজের ময়দানকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলো। এই পদ্ধতির অনুসরনের কারনে এমন প্রতিটি তানজিম নিজ নিজ অঞ্চলে অত্যন্ত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ক্বাইদাতুল জিহাদ ও এর গ্লোবাল জিহাদের মানহাজের জন্মই হয় প্রথম পর্যায়ের এ মানহাজের ব্যর্থতা থেকে উত্তরনের উদ্দেশ্যে।
আমাদের ভূখন্ডে দুটি জিহাদি জামা’আহ – হরকাতুল জিহাদ এবং জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ – সাধ্যমত অঞ্চল ভিত্তিক মানহাজ অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। কিন্তু অবধারিতভাবেই অন্যান্য জায়গাতে যা হয়েছিল, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি হয়। আর এর কারন হল আল্লাহর কিছু অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে যেগুলর ব্যাপারে কেউই ছাড় পায় না। যারা অঞ্চল ভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করেছেন এই ভূখণ্ডে এবং অন্যত্র, তাদের ব্যর্থতার মূল কারন হল অঞ্চলভিত্তিক তাগুত উৎখাতের এ পদ্ধতির মৌলিক দুর্বলতা। এর অর্থ এই না যে এসব তানজিমের সদস্যদের ইখলাস বা দক্ষতা ছিল না। বরং আমরা উল্টোটাই মনে করি,

এবং সুধারণাই রাখি। কিন্তু যদি পদ্ধতি ভুল হয়, সেক্ষেত্রে ফলাফল কেমন হবে তা পূর্বনির্ধারিত।
দুঃখজনক ব্যাপার হল, বর্তমানে এমন অনেক ভাই আছেন যারা ক্বাইদাতুল জিহাদ এর মানহাজ বোঝেন, অনুসরণ করেন, কিংবা জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার কথা দাবি করেন। কিন্তু দেখা যায়, তারা আসলে মানহাজ বলতে প্রথম পর্যায়ের এই আঞ্চলিক জিহাদের মানহাজকে বুঝে থাকেন। পার্থক্য হল তারা একটা গ্লোবাল বা বৈশ্বিক সংগঠনের অধীনে এই আঞ্চলিক জিহাদের মানহাজ অনুসরণ করাকে, গ্লোবাল মানহাজ মনে করেন। একই ভুল বারবার হতে দেখা হতাশাজনক।
যাই হোক। আঞ্চলিক জিহাদের মানহাজের দুর্বলতা সম্পর্কে ক্বাইদাতুল জিহাদ সর্বপ্রথম এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষন করে। এবং কোন কোন ব্যবসাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ, অর্থাৎ কোন কোন ভূমিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, এবং কীসের ভিত্তিতে এ নিয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত ও সুক্ষ আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষন তুলে ধরে। আর এর উপর ভিত্তি করেই ক্বাইদাতুল জিহাদ তাদের গ্লোবাল মানহাজ ও পরিকল্পনা নির্ধারন করে কাজ করেছে এবং করে যাচ্ছে। জিহাদি আন্দোলনের পরিকল্পনা ও কৌশল সংক্রান্ত কিতাবসমূহে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে সেগুলোর কিছুটা আলোচনা করবো।
বিভাজনঃ
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ও ভূখন্ডগুলোর মধ্যে কীভাবে জিহাদি আন্দোলনের সীমিত সক্ষমতা (পুঁজি) কাজে লাগানো হবে এ ব্যাপারে ক্বাইদাতুল জিহাদের স্ট্র্যাটিজিস্ট বা সমরকৌশলবিদ শায়খ আবু বাকর নাজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন –
‘…সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণের পর জিহাদি আন্দোলন কিছু ভূখন্ডকে, আরো সঠিকভাবে বললে কিছু অঞ্চলকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অঞ্চল হিসেবে নির্ধারিত করেছে। এই ‘অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত’ অঞ্চলগুলো হবে মুজাহিদিনের কাজের ও মনযোগের মূল কেন্দ্র। মুজাহিদিন তাদের কেন্দ্রীভূত আক্রমনী শক্তি এসব অঞ্চলে কাজে লাগাবেন, যাতে করে তাদের (সীমিত) শক্তি এমন সব অঞ্চলে ক্ষয় না হয় যেখানে শক্তিপ্রয়োগ (দীর্ঘমেয়াদী) কোন ফলাফল বয়ে আনবে না।’ [ইদরাতুল তাওয়াহ্হুশ, আবু বাকর নাজি] শায়খ আবু বাকর নাযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুজাহিদ উমারাহ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অঞ্চল নির্ধারনের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কোন ভূখণ্ড বা অঞ্চল, ‘অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত’ বলে গণ্য হবার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা আবশক্য সেগুলো হল –

– ১/ ভৌগলিক গভীরতা (Geographical Depth) – অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে দেয়ার জন্য কোন অঞ্চলের ভৌগলিক উপযোগিতা।
– ২/উক্ত অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় শাসন তুলনামূলকভাবে দুর্বল হওয়া। অর্থাৎ ক্ষমতার কেন্দ্র (রাজধানী) থেকে দূরবর্তী ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শাসকের নিয়ন্ত্রন তুলনামূলক ভাবে দুর্বল হওয়া
– ৩/ জিহাদ, ইসলামি শাসনের ব্যাপারে দাওয়াহ ব্যাপক হওয়া
– ৪/ উক্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠী চিন্তাগত মানসিক গঠনের দিকে দিয়ে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত হওয়া – এই ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের লোকের উপর অন্য অঞ্চলের লোকের প্রাধান্য দিয়েছেন
– ৫/ অস্ত্রের সহজলভ্যতা
সুতরাং কোন অঞ্চল জিহাদি সামরিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে কি না, সেটা বিবেচনার সময় আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে ঐ অঞ্চলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কোন কোন মাত্রায় আছে, বা আদৌ আছে কি না।
সামরিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলো ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলগুলোর কিছু দুর্বলতা আছে, এমনকি যেগুলোতে মোটামুটি শক্তিশালী ইসলামি আন্দোলন বা চেতনা আছে অথবা জিহাদি তানযিমের অস্তিত্ব আছে, সেগুলোতেও। এই দুর্বলতাগুলো হল –
– ১/ শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী
– ২/ শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, এবং ক্ষমতার প্রভাব বিস্তৃত। এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে শক্তিশালী সরকারবিরোধী মনোভাব ও বিদ্রোহ আছে
– ৩/ মুজাহিদিনের চলাচলের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত
– ৪ /সমাজ ও জনগণের মানসিকতা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত না
লক্ষ্য করুন, পুরো বিষয়টা নির্ধারন করা হচ্ছে সফলভাবে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে। আর এর কারন হল মুজাহিদিনের বর্তমান সক্ষমতায় কোন তাগুত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে, কোন ভুমি দখল করে, স্বল্প সময়ে পূর্ণ তামকিন (কর্তৃত্ব) অর্জন করা ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব। যার প্রমান জামাতুল বাগদাদির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি।
শায়খ আবু মুস’আব আস-সুরির ফাকাল্লাহু আসরাহ গবেষণাতেও একই রকম সিদ্ধান্ত উঠে এসেছে। তিনি কোন ভূমি থেকে তাগুতকে হটানো, সেখানে তামকিন অর্জন এবং শারীয়াহ প্রতিষ্ঠাকে ময়দানি যুদ্ধের (Open Front Jihad) সাথে সংযুক্ত করেছেন। তার উপসংহার হল, ময়দানি যুদ্ধ ব্যাতীত অপর কোন পন্থায় এসবগুলো উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব না। কোন ভূখন্ড/অঞ্চলে মুজাহিদিন ময়দানি যুদ্ধে জড়ানোর কথা বিবেচনা করবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন –

গেরিলা যোদ্ধার সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা হল ভুল সময়ে স্থায়ী ঘাঁটি থেকে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া। নিজের স্থায়ী ঘাঁটি ও নিরাপদ আশ্রয় স্থল (safe haven) রক্ষার যুদ্ধে বাধ্য হওয়া গেরিলার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক…
ময়দানি যুদ্ধে সফল হবার জন্য কিছু কৌশলগত পূর্বশর্তের উপস্থিতি আবশ্যক। আর সফলতা কেবল আল্লাহরই পক্ষ থেকে।
আবশ্যক পূর্বশর্ত – ভৌগলিক
১) উক্ত অঞ্চল বিস্তৃত হওয়া যেখানে স্বাধীনভাবে মুজাহিদিন চলাচল করতে পারবে
২) বিভিন্ন ধরনের এলাকা থাকা (পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি ইত্যাদি), লম্বা সীমান্ত থাকা
৩) এমন জায়গা যা অবরোধ করে রাখা কঠিন
৪) কিছুটা হলেও পাথুরে পার্বত্য অঞ্চল, জঙ্গল বা এধরনের এলাকা থাকা। কারন এরকম স্থানে শত্রু ছোট জায়গায় অনেক সেনা জমায়েতে বাধ্য হয়, এবং তাদের মোকাবেলা করা সহজ হয়। এক্ষেত্রে গাছে ঢাকা পাহাড় সর্বাপেক্ষা উত্তম।
৫) পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ও পানির উৎস থাকা, যাতে করে অব্ররোধ করা হলেও মুজাহিদিন টিকে থাকতে পারে
জনগোষ্ঠী
প্রচুর পরিমাণে এমন জনগণ থাকা যাদের চলাফেরার উপর নজরদারি করা সম্ভব না। বিশেষ করে এমন জনবসতিপূর্ণ পল্লী অঞ্চল, এবং ঘনবসতি পূর্ণ শহর থাকা উত্তম। একই সাথে উক্ত অঞ্চলের যুবকে মাঝে যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও জেদ থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন সামরিক যোগ্যতা ও অধ্যাবসায়। উক্ত অঞ্চলে অস্ত্রের সহজলভ্য উৎস থাকা প্রয়োজন। [দাওয়াতুল মুয়াক্বাওয়ামা আল-ইসলামিয়্যাহ আল-‘আলামিয়্যাহ]
শায়খ আবু মুস’আব তিনটি ময়দানি যুদ্ধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তার উপসংহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেছেন। এ তিনটি ময়দান হল – আফগানিস্তান, চেচনিয়া এবং বসনিয়া।
এর মধ্যে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে সবগুলো বৈশিষ্ট্য উপস্থিত ছিল।
চেচনিয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উপাদান উপস্থিত ছিল।
বসনিয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত ছিল, যেমন অস্ত্রের সহজলভ্যতা, জনগনের যুদ্ধংদেহী ও জেদি মনোভাব।
এই তিনটি ময়দানের মধ্যে বসনিয়ার জিহাদ উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। চেচনিয়ার জিহাদ আংশিকভাবে সফল হয়, এবং আফগান জিহাদ সম্পূর্ণভাবে সফল হয়।

এ বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি শায়খ আবু মুস’আব এবং শায়খ আবু বাকর নাযি – দু’জনেই জনসমর্থনকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
শায়খ আবু মুস’আব তার এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ময়দানি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত কিছু ভূমির নাম উল্লেখ করেছেনঃ
আফগানিস্তান
মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ
ইয়েমেন তথা জাযিরাতুল আরব
মরক্কো ও উত্তর আফ্রিকা
বিলাদ আশ-শাম
অন্যদিকে আবু বাকর নাযি রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন ৯/১১ এর পর (২০০৩ এর আগে) তানযিম ক্বাইদাতুল জিহাদের পক্ষ থেকে যেসব অঞ্চলকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচনা করা হচ্ছিলো তার মধ্যে ছিলঃ
জর্ডান
ইসলামি মাগরিব
নাইজেরিয়া
ইয়েমেন
বিলাদ আল-হারামাইন
পাকিস্তান
আজ এক দশকেরও বেশি সময় পর দেখা যাচ্ছে শায়খগণ তাদের বিশ্লেষণে সঠিক ছিলেন।
উপসংহারঃ
উপরে আমরা দুজন মুজাহিদ সমরকৌশলবিদের বিশ্লেষন অতি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। দুজনের বক্তব্যে সারসংক্ষেপ হল –
১) মুজাহিদিনের সামর্থ্য সীমিত
২) এই সীমিত সামর্থ্য কিছু অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হবে
৩) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ভূমির কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে – যেমন দীর্ঘ ম্যেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী ভৌগলিক অবস্থা, মুজাহিদিনের স্বাধীনভাবে চলাচলের সুযোগ, অস্ত্রের সহজলভ্যতা, জনগোষ্ঠীর যুদ্ধংদেহি ও জেদি মনোভাব, তাগুতের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হওয়া, জনসমর্থন।
৪) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ভূমি/অঞ্চলগুলোতে মুজাহিদিন তাগুত শাসকগোষ্ঠীর সাথে ময়দানি যুদ্ধে যাবেন এবং তাগুতি শাসন উচ্ছেদ করে, তামকিন অর্জন ও ইসলামি শাসন কায়েমের চেষ্টা করবেন
এখানে দু’জনের বক্তব্য তুলে ধরা হলেও বস্তুত এটিই কেবল এ দু’জনের অবস্থান না। বরং এই বিশ্লেষনই ক্বাইদাতুল জিহাদের বিশ্লেষণ। গত এক দশকে প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারনে কিছু

ছোটখাটো পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মৌলিক কাঠামোগত কোন পরিবর্তন আসে নি। এবং এর প্রমান হল হাকিম আল-উম্মাহ শায়খ ডঃ আইমান আয-যাওয়াহিরীর হাফিযাহুল্লাহ নিম্নোক্ত বক্তব্য –
আমেরিকার তাবেদারদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ব্যাপারে বলতে হলে, এর বাস্তবতা একেক জায়গায় একেক রকম। এক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে, তাদের সাথে যে কোন সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া, শুধুমাত্র সেই দেশসমূহ ব্যতীত যেখানে সম্মুখ সমরে তাদের মোকাবেলা করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। [জিহাদের সাধারণ দিক-নির্দেশনা]
এই ভূখণ্ডে ও অঞ্চলে জিহাদি তানযিমগুলোর ভূমিকাকে ক্বাইদাতুল জিহাদ কীভাবে দেখে তা অনুধাবনের জন্য অঞ্চলসমূহের এ বিভাজন ও এর ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের পরিস্কার ধারনা রাখা প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন এ নিয়ে গভীর চিন্তা। উপরের বিশ্লেষণের আলোকে আমাদের এ ভূখণ্ড কোন শ্রেণীতে পরে সেটাও আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। আর বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য এ প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করা একেবারেই কঠিন হবার কথা না।
তবে উপরের আলোচনার পর প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলোর বাইরে যে ভূখন্ড-অঞ্চল রয়েছে সেখানে জিহাদি তানযিমের ভূমিকা কী হবে। ইনশা আল্লাহ পরবর্তী পর্বে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আমরা দেখেছি, খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল গণতন্ত্র, নুসরাহ, কিংবা আগে খিলাফাতের ঘোষণা তারপর বিশ্বব্যাপী জিহাদ- ইত্যাদি বিভিন্ন মানহাজ তথা পদ্ধতির কথা বললেও বাস্তবতা হল, শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেই শেষ পরিণতি হল দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। এ গেরিলা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বড়জোর আঞ্চলিক ইমারাহ গঠন সম্ভব এবং নিয়ন্ত্রানাধীন জায়গায় শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু কোন ভাবেই সমগ্র মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব গ্রহণ, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুসলিমদের সকলকে সাহায্য করা এবং দখলকৃত সকল মুসলিম ভূমি মুক্ত করার লক্ষ্যে সকল স্থানে জিহাদ করতে সক্ষম এরকম একটি কেন্দ্রীয় খিলাফাহ গঠন করা সম্ভব না। বর্তমানে ইসলামের জন্য মুজাহিদিন – যাদেরকে পশ্চিমা ও তাদের তোতাপাখিরা “সন্ত্রাসী” বলে – তারা ছাড়া আর কেউ জিহাদ করছে না। মুসলিম ভূমিগুলোর উপর মুরতাদ তাউয়াজ্ঞীত শাসকগোষ্ঠী কুফফারের সহায়তায় জেঁকে বসে আছে, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কুফফার এবং মুসলিম তথা মুজাহিদিনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে, এবং

সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের সাধারণ জনগণ তাদের ফরয জিহাদের দায়িত্ব, খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এবং নির্যাতিত মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে বে খবর কিংবা গাফেল হয়ে আছে। উম্মাহকে নেতৃত্ব দেবার এবং দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংসকারী এই বিপদজনক শীতনিদ্রা জাগাবার গুরুদায়িত্ব পালন যাদের করার কথা, সেই উলেমাগণের অধিকাংশই এই দায়িত্বকে ত্যাগ করেছেন। এই বিবিধ কারণে মুজাহিদিন এবং কুফফারের শক্তির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। লোকবল, প্রযুক্তি, অর্থ এবং অস্ত্র কোন দিক দিয়েই মুজাহিদিনের অবস্থা কুফফারের এক-দশমাংশও নয়। এছাড়া কুফফারের এমন একটি অস্ত্র রয়েছে যার প্রতিউত্তর দেয়ার কোন উপায় মুজাহিদিনের নেই – আর তা হল এরিয়াল বম্বিং বা বিমানহামলা। এ পর্যায়ে কোন ভাই প্রশ্ন করতে পারেন, “কেন আমরা দুনিয়াবী হিসেব-নিকেশের জন্য আল্লাহর দেয়া খিলাফা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবো না? আমাদের কি দুনিয়াবি হিসেব-নিকেশ ছেড়ে তাওয়ায়ক্কুল করা উচিৎ না?”
এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো – অবশ্যই সাহায্য ও বিজয় একমাত্র আল্লাহ-র পক্ষ থেকে। এবং আমাদের সাধ্য যতোই কম হোক, আল্লাহ্ যা আমাদের উপর ফরয করেছেন সেই কাজ কখনোই ত্যাগ করা যাবে না। যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়ে আল্লাহ-র উপর ভরসা করে কাজে নেমে যেতে হবে। একথার সাথে আমরা পুরোপুরি একমত পোষণ করি। আর মুজাহিদিনরা এই কাজই করে আসছেন। আফগানিস্তানে অ্যামেরিকা এসেছিলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, কিন্তু ৫০ বছর আগের কোরিয়া যুদ্ধের আমলের একে-৪৭ হাতে, ইস্তেশহাদী বেল্ট পরিহিত, মৃত্যুকে জীবনের চাইতে অধিক ভালোবাসা মুসলিম তরুনদের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু একই সাথে আমাদের এও মনে রাখতে হবে শারীয়াহর আহকাম, মাস’আলা এবং পরিভাষাগুলো নিছক কিছু শব্দ বা বুলির সমাহার না। এগুলো হল কিছু নির্দিষ্ট ধারণা, যেগুলোর প্রতিটির নির্দিষ্ট বাস্তবতা আছে। খিলাফাহ একটি ধারণা যার একটি বাস্তবতা আছে। যদি চার ফিট বাই চার ফিট – একটি কামরাকে ঈদগাহ ময়দান ঘোষণা করে কেউ বলে, এখানে পুরো গ্রামের ২ লাখ মানুষের ঈদের সালাত আদায় করা হবে- তবে সেটা বাস্তবতা বিবর্জিত একটি ঘোষণা। একইভাবে একটি ভুখন্ডের উপর সাময়িক তামক্বীন অর্জন করে যদি বলা হয় এটা খিলাফাহ যা সমগ্র মুসলিমদের দায়িত্ব গ্রহণ করছে – তখন সেটাও বাস্তবতা বিবর্জিত। একারনে খিলাফাহ আমরা তখনই ঘোষণা করতে পারি, যখন আমরা খিলাফাহর উপর শার’ঈ ভাবে যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে সেগুলো পালন করতে পারি। অন্যথায় মৌখিক ঘোষণার কোন মূল্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সক্ষমতা অর্জিত না হবে ততোক্ষণ মুজাহিদিনের দায়িত্ব হল জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে

শারীয়াহর মাধ্যমে শাসন করা। এটা হতে পারে ইমারাহ ঘোষণার মাধ্যমে – যেমন ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান, ইমারাতে কাভকায। কিংবা হতে পারে ইমারাহ ঘোষণা ছাড়াই, যেমন আল-শাবাব, AQAP, AQIM ইত্যাদি করছে।
উসামার মানহাজঃ
আমরা কেন “উসামার মানহাজ” বলছি? কেন জিহাদের মানহাজ কিংবা আল-ক্বাইদার মানহাজ বা অন্য কিছু বলছি না? এটি একটি সংগত প্রশ্ন। কারণ আমরা জানি জিহাদ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, দল বা সময়ের উপর নির্ভরশীল না। জিহাদ বলবৎ থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। তাহলে কেন আমরা “উসামার মানহাজ” নিয়ে এতো আলোচনা করছি? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে।
রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ ছিল মুসলিম উম্মাহ-র প্রতি আল্লাহর একটি নি’আমত। হ্যা, একথা সত্য লাখো আফগান এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্ত এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ কয়েক শো বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো মুসলিমদের একটি পশ্চিমা পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিজয় দিয়েছেন। এবং আফগানিস্তানের মাটি থেকেই বৈশ্বিক জিহাদের সূচনা হয়েছে। আফগানিস্তানের জিহাদের আগে, তানজীম আল-ক্বাইদা গঠনের আগে কি জিহাদ ছিল না? অবশ্যই ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদি সংঘটন জিহাদের কাজ করছিল যেমন, মিশরের জামাহ ইসলামিয়্যাহ, আল-জিহাদ, লিবিয়ার এলএফআইজি, সিরিয়ার শাইখ মারওয়ান হাদীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত মুসলিম ব্রাদারহুডের সশস্ত্র অংশ, আলজেরিয়া এবং ইয়েমেনের কিছু ছোট ছোট জামা’আ। কিন্তু এ প্রতিটি জিহাদি জামা’আর উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক। তারা নিজেদের ভূখণ্ড থেকে তাগুতকে উৎখাত করে শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছিলেন। এই জামা’আ গুলোর কোন বৈশ্বিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করছিলেন। একই সাথে জাতীয়তা, আক্বীদা, মাযহাব-মাসলাক গত উন্নাসিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা এসব জামা’আর মধ্যে ছিল এই ধারণায় প্রথম যে ব্যক্তি পরিবর্তন আনেন, তিনি হলেন শাইখুল মুজাহিদিন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম।
শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র ও স্বল্পমেয়াদী আঞ্চলিক উদ্দেশ্যের বদলে মুজাহিদিনের ধ্যানধারনায় একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামো তৈরি করেন। আফগান জিহাদের শেষ দিকে যখন রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তখন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম এবং তার অনুগত আরব মুজাহিদিনের একটি অংশ জিহাদী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ আবু ফিরাস আস সুরি, শাইখ আবু মুসাব আস-সুরি, শাইখ আবু খালিদ আস-সুরি রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মাদ আতেফ রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ সাইফ

আল আদল, শাইখ মুহাম্মাদ ইসলামবুলি [আনওয়ার সাদতের হত্যাকারী মহান বীর খালেদ ইসলামবুলির ভাই], শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি এবং অন্যান্য আরো অনেকে। এসব বরেণ্য ব্যক্তিদের সবাই দুটি বিষয়ে একমত ছিলেন। ১) মুসলিম উম্মাহর উত্তরনের একমাত্র পথ – জিহাদ, ২) আফগানিস্তানের মাটিকে জিহাদের জন্য একটি ঘাঁটি তথা লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু ২ নম্বর বিষয়টি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ, এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল।
শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চিন্তা ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে মুজাহিদিনের একটু ঘাঁটি তৈরি করা, যাতে সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম যুবকরা এসে প্রশিক্ষন গ্রহণ করতে পারবে, এবং তারপর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে জিহাদ শুরু করবে। প্রয়োজনে তাদের আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা দেয়া হবে। পাশাপাশি একটি অগ্রবর্তী দল গঠন করা হবে, যাদের কাজ হবে ফিলিস্তিনে গিয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এবং মুসলিম বিশ্বের যেখানেই মুসলিম নির্যাতিত হবে, আফগানিস্তানের মাটি থেকে, এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিন সেখানে গিয়ে মুসলিমদের সহায়তায় জিহাদ করবেন। আল-ক্বাইদা [শাব্দিক ভাবে যার অর্থ হল “ঘাটি/ভিত্তি”] নামটির উৎস শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামই।
আল-জিহাদ এবং জামা’আ ইসলামিয়্যার মিশরিয় মুজাহিদিনের চিন্তা ছিল মিশরের মুজাহিদিনকে আফগানিস্তানের মাটিতে মিশরে জিহাদ করার জন্য প্রশিক্ষন দেয়া এবং একটি অগ্রবর্তী বাহিনী তৈরি করা। জিহাদের মাধ্যমে মিশরের ক্ষমতা দখল করা, তারপর মিশরকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা। আলজেরিয়া এবং লিবিয়ার মুজাহিদিনের একইরকম পরিকল্পনা ছিল নিজ নিজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন । শাইখ মতব্যক্ত করলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। সারা বিশ্ব থেকে আসা মুসলিম যুবকদের এবং জিহাদী বিভিন্ন জামা’আর সদস্যদের সেখানে প্রশিক্ষন দেয়া হবে। নিজ নিজ ভুখন্ডে জিহাদী কার্যক্রম চালানোর জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেয়া হবে। নিপীড়িত মুসলিমদের সুরক্ষায় এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিনকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হবে। এ সবই ঠিক আছে। একই সাথে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী গঠন করতে হবে। কিন্তু এই অগ্রবর্তী বাহিনীর লক্ষ্য শুধুমাত্র কোন আঞ্চলিক তাগুতকে উৎখাত করা না। নিছক ভূমি দখল করা না। ইস্রাইলের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো না। বরং এই অগ্রবর্তী দলের উদ্দেশ্য হবে বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামোকে উল্টেপাল্টে দেয়া। কুফরের সিংহাসন ভেঙ্গে ফেলা, এবং শক্তির যে ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান তা কমিয়ে আনা। এবং জিহাদকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার

মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা। এবং কুফরের কেন্দ্র, কুফরের পরাশক্তি, এ যুগের হুবাল অ্যামেরিকাকে আঘাত করা।
যখন এরকম বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা চলছিল এমন অবস্থায় পাকিস্তানে এক বোমা বিস্ফোরণের শাইখুল মুজাহিদিন আব্দুল্লাহ আযযাম মৃত্যু বরণ করেন। আল্লাহ্ যেন আকে রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখেন, এবং তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আন্তর্জাতিক কুফর মিডিয়া আজো শাইখের পরিচয় দেয়ার সময় তাঁকে “Godfather of global jihad” – বলে আখ্যায়িত করে। যদিও তারা মিথ্যাবাদী, তবে তারা এক্ষেত্রে সত্য বলেছে। এই মহীরুহের শিক্ষা আজো জীবন্ত। আফগান রণাঙ্গনে তার শিক্ষা যতোটুকু উপযুক্ত, কারযযরকরি এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ ছিল, আজ তিন দশক পর বাংলাদেশ, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনের মাটিতেও তা একই রকম কার্যকরী, উপযুক্ত ও সফল। শাইক আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর, শাইখ উসামাকে আরব মুজাহিদিনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং আল-ক্বাইদার আমীর নিযুক্ত হন। শাইখ উসামার পরিকল্পনায় আল-ক্বাইদার মানহাজ হিসেবে গৃহীত হয়। শাইখ উসামার “সাপের মাথায় আঘাত করা”-র এই পরিকল্পনা নিচে তুলে ধরা হল।
সাপের মাথায় আঘাত কর !
শাইখ উসামার মানহাজকে যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তবে তা হবে এই – “সাপের মাথায় আঘাত কর”। এখানে সাপ দ্বারা বোঝানো হয় বিশ্ব কুফর শক্তিকে। পশ্চিমা কুফর শক্তির আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক শক্তি, ইস্রাইল এবং পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বে কুফফারের দালাল শাসকগোষ্ঠী, এই তাউয়াগীত শাসকগোষ্ঠীর অনুগত মুসলিম দেশগুলোর সামরিক বাহিনী – এ সবকিছুর সমন্বয়ে, সম্মিলিত বিশ্ব কুফর শক্তি হল একটি বিশালদেহী বিষাক্ত সাপের মত। আর এই সাপের মাথা হল অ্যামেরিকা। সাপের বিষ থাকে সাপের মাথায়। তাই সবচেয়ে দ্রুত, সবচেয়ে কম শক্তিক্ষয়ে যদি কেউ সাপকে হত্যা করতে চায়, তাহলে তার উচিৎ হবে সাপের মাথা কেটে ফেলা। সাপের মাথা কেটে ফেলা হলে পুরো শরীর নিয়ে অধিক চিন্তার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যদি মাথা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আঘাত করা হয়, সেক্ষেত্রে বিষাক্ত ছোবল থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না।
ধরা যাক, আমরা মুসলিম বিশ্বের কোন একটি তাগুত থেকে উৎখাত করতে চাই। হতে পারে এটা মিশর, কিংবা সাউদী আরব কিংবা বাংলাদেশ। যেমন মিশরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, মুজাহিদিন তাগুত আনওয়ার সাদাতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর কি দেখা গেল? সাদাতের জায়গায় অ্যামেরিকা আরেক তাগুত, আরেক পুতুল হোসনি মোবারককে বসিয়ে দিল। হুকুমাতকে দুর্বল করা গেল না, শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা গেল না। এর কারণ হল- এই তাগুতের পেছনে মূল শক্তি হল

অ্যামেরিকা। তাই মূল শক্তিকে না সরিয়ে যতোজন সাদাতকে হত্যা করা হোক না কেন, তাতে অবস্থার পরিবর্তন হবে না।
একইভাবে যদি আমরা ইস্রাইলের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই তাদের তিনদিকে তারা আরব মুসলিমদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর অপরদিকে হল সমুদ্র। তারা হল সংখ্যায় দিক দিয়ে নগন্য কিছু কাপুরুষ ইহুদী। কিন্তু এরাই দশকের পর দশক পুরো অঞ্চলের উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে এটা কি ভাবে সম্ভব? তাদের কোন খনিজ সম্পদ নেই, তারা ব্যাপকভাবে কৃষিপন্য উৎপাদন করে না। তাদের বিশাল বিশাল ইন্ডাস্ট্রি নেই। তাহলে তাদের শক্তির উৎস কি? তাদের শক্তির উৎস হল অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকাই জাতিসংঘ তৈরি করে ইস্রাইল রাষ্ট্র গঠন করার ব্যবস্থা করেছে এবং স্বীকৃতি জোগাড় করেছে। অ্যামেরিকায় ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি আর্থিক ও সামরিক সাহায্য ইস্রাইলকে দিচ্ছে। অ্যামেরিকাই ইস্রাইলের তিন পাশে থাকা মুসলিম ভূখণ্ডের [জর্ডান,লেবানন, সিরিয়া,মিশর] মুরতাদীন শাসকগোষ্ঠীকে লালনপালন করছে, এবং এই শাসকদের মাধ্যমে ইস্রাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এই দেশগুলোর শাসকরা নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম, কিন্তু প্রভু অ্যামেরিকাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এরা মুজাহিদিনের হামলা থেকে ইস্রাইলকে রক্ষা করার জন্য ইস্রাইলের সীমানায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শুধু তাই না ইস্রাইলের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের সর্বশক্তি তারা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। তাই ইস্রাইলের বাইরে থেকে ইস্রাইলে ঢুকে যদি মুজাহিদিন হামলা চালাতে চান, তাহলে প্রথমে এসব অ্যামেরিকার আজ্ঞাবাহী সরকারগুলোকে উৎখাত করতে হবে। আর যদি অ্যামেরিকাকে দুর্বল না করে সরকারগুলোকে উৎখাত করা হয়, তাহলে পুরনো পুতুলের বদলে নতুন এক পুতুল ক্ষমতায় আসবে। যেমন সাদাতের পর মোবারক এসেছে। মোবারকের পর সিসি এসেছে।
সুতরাং এই সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানের জন্য আগে অ্যামেরিকাকে আঘাত করতে হবে। একবার যদি অ্যামেরিকার মুসলিম বিশ্বে নাক গলানোর ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন এসব তাউয়াগীতের অপসারণ ইন শা আল্লাহ্* সামান্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। একারণে খিলাফাহ ঘোষণা এবং ইস্রাইল তথা ইহুদীদের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলার আগে অ্যামেরিকাকে দৃশ্যপট থেকে সরানো জরুরি।
এই উদ্দেশ্য নিয়ে শাইখ উসামা এবং আল-ক্বাইদা তাদের কাজ শুরু করে। পাশাপাশি তারা আঞ্চলিক জিহাদী আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করতে থাকে, এবং নিজেদের নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।
অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আল-ক্বাইদার প্রথম সফল, অফিশিয়াল হামলা ছিল ছিল নাইরোবি ও দারুস সালামে অ্যামেরিকার দূতাবাসে জোড়া

বোমা হামলা। এর আগে অ্যামেরিকার সেনাদের লক্ষ্য করে ৯২ – এ ইয়েমেনে হোটেল বোমা হামলা, ৯৩ সালে মোগাদিসুতে আরপিজির মাধ্যমে দুটি ব্ল্যাক হ’ক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার সাথেও আল-ক্বাইদার সম্পৃক্ততা ছিল। নাইরোবি ও দারুস সালামের জোড়া হামলা হয়, ৯৮ এর অগাস্টে। এর আগে ৯৩ এর ফেব্রুয়ারী মাসে, শাইখ উসামা World Islamic Front for Combat Against the Jews and Crusaders (ইহুদী ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বৈশ্বিক ইসলামি ফ্রন্ট) তৈরির ঘোষনা দেন। এ ঘোষনায় শাইখ আইমান আল যাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ আল-জিহাদের পক্ষ থেকে এবং শাইখ ফাজলুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ হারাকাতুল জিহাদের পক্ষ থেকে সই করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের একত্রিত হয়ে ইহুদী ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আহবান করা হয় – এবং পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে অ্যামেরিকাকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়। এর আগে বিলাদুল হারামিনে অ্যামেরিকার সেনাদের উপস্থিতির কারণে, ১৯৯৬ সালে শাইখ আরেকটি ঘোষণা দেন যেখানে তিনি আলাদা করে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালে ইয়েমেনের আদেন বন্দরের কাছাকাছি অবস্থিত ইউ.এস.এস কোলে আল-ক্বাইদা হামলা চালায়।
৯ / ১১ঃ
নব্বইয়ের দশক জুড়ে বারবার শাইখ উসামা অ্যামেরিকার উপর হামলা চালান। পরতিটী হামলার ক্ষেত্রে কিছু আঞ্চলিক উদ্দেশ্য ছিল, এবং একই সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যও ছিল। যেমন আদেনে ইউ.এস.এস কোলে হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইয়েমেন থেকে অ্যামেরিকার সেনাদের বিতাড়িত করা, এবং অ্যামেরিকাকে এই বার্তা দেয়া যে পৃথিবির কোথাও তারা আল-ক্বাইদার কাছ থেকে নিরাপদ না। কিন্তু এসবের পাশাপাশি একটি মূল বৈশ্বিক লক্ষ্য নিয়েও এসব হামলা চালানো হচ্ছিল। আর তা ছিল, অ্যামেরিকাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা। শাইখ উসামা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন – অ্যামেরিকাকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা করে, তাদেরকে সেসব জায়গা থেকে সাময়িকভাবে বিতাড়িত করা তো সম্ভব হবে, কিন্তু তাদের সামরিক সক্ষমতাকে নষ্ট করা যাবে না। আর যতোদিন পর্যন্ত অ্যামেরিকার এই প্রবল সামরিক শক্তি ও দানবীয় অর্থনীতি বিদ্যমান থাকবে – ততোদিন অ্যামেরিকাকে হারানো যাবে না, এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। কারণ যখনই কোন জায়গায় কোন ইসলামি দল বা আন্দোলন অ্যামেরিকার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, এবং খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি করবে – তখনই অ্যামেরিকা সেটাকে আক্রমণ করে সেই দলকে বা আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দেবে। একারণে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আগে প্রয়োজন অ্যামেরিকার এই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নষ্ট করা।

একারনে অ্যামেরিকার উপর প্রতিটি হামলার ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ছিল অ্যামেরিকাকে কোন একটি মুসলিম ভূখণ্ডে টেনে আনা। কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণিত হামলা গুলো সফল হওয়া সত্ত্বেও, শাইখ উসামা অ্যামেরিকার দিক থেকে যে প্রতিক্রিয়া আশা করছিলেন, তা পাচ্ছিলেন না। বারবার মার খেয়েও অ্যামেরিকা ঠান্ডা মাথায় নিজের চাল ঠিক করছিল। একারণে দরকার ছিল এমন একটি আক্রমণ যা অ্যামেরিকাকে বাধ্য করবে আল-ক্বাইদার বিরুদ্ধে মুসলিম কোন একটি ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে। একই সাথে এই হামলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ-র জন্য একটি জাগরণী বার্তা হিসেবে কাজ করবে যা উম্মাহ-র যুবকদের মনে জিহাদের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত করবে। সর্বোপরি এটি হবে এমন একটি হামলা, যা সমগ্র পৃথিবীর সামনে সুপারপাওয়ার অ্যামেরিকার “অজেয়” ভাবমূর্তিকে তছনছ করে দেবে। আর এই প্রেক্ষাপটেই, এসকল উদ্দেশ্য সামনে নিয়েই সংঘটিত হয় বরকতময় মঙ্গলবারের, গাযওয়াতুল ম্যানহাটন বা ৯/১১ এর হামলা। ৯/১১ হামলার মূল পরিকল্পনা শুরু হয় প্রায় ৫ বছর আগে, ১৯৯৬ এ। শাইখ খালিদ শাইখ মুহাম্মাদ ফাকাল্লাহু আশরাহ এই সময় অ্যামেরিকাতে হামলা করার জন্য প্যাসেঞ্জার বিমান ব্যবহার করার সম্ভাবনার কথা উপস্থাপন করেন। এ সময় শাইখ খালিদ আল-ক্বাইদার সদস্য ছিলেন এবং শাইখ উসামার প্রতি তাঁর বাই’য়াহ ছিলো না, যদিও আল-ক্বাইদার নেটওয়ার্কের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে ৯/১১ এর আক্রমণের আগে শাইখ খালিদ, শাইখ উসামাকে বাই’য়াহ দেন এবং আল-ক্বাইদার সদস্য হন। আল-ক্বাইদার ইতিহাসে এই প্যাটার্নটি বারবার দেখা গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জামা’আর সবচেয়ে মেধাবী সদস্যদের বাছাই করে আল-ক্বাইদা নিজেদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। শাইখ আবু ইয়াহিয়া আল লিব্বি রাহিমাহুল্লাহ এরকম আরেকটি উদাহরণ। জিহাদি সংঘঠনগুলোড় মধ্যে আল-ক্বাইদার অবস্থান অনেকটা অক্সফোর্ডের মত – সর্বাধিক মেধাবী, উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় যোদ্ধারাই কেবল এতে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পায়।
১৯৯৬ থেকেই আক্রমণের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শুরু হয়। মূল আক্রমণকারী টিমের সদস্য বাছাই করা হয়, তাদের প্রশিক্ষন দেয়া হয়। আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপদ ব্যাঙ্কিং রুট ঠিক করা হয়। আক্রমণের শেষ পর্যায়ে শাইখ উসামা নিজে টার্গেট ঠিক করেন। এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। আল-ক্বাইদার উচ্চ পর্যায়ের অনেক সদস্য এবং হামলার লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে জানতেন না, শুধু জানতেন অ্যামেরিকার প্রাণকেন্দ্রে বিশ্ব কাপিয়ে দেয়ার মতো একটি অপারেশান হতে যাচ্ছে। এমনকি আক্রমণকারী টিমের আমিররা ছাড়া অন্যান্য সদস্যরাও একে বারে শেষ পর্যায়ে

লক্ষবস্তু সম্পর্কে জানতে পারেন।
৯ / ১১ হামলার পেছনে শাইখ উসামার তিনটি মূল লক্ষ্য ছিলঃ
১) অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে টেনে আনা, এবং সেখানে তাদের আটকে ফেলা। পাশাপাশি অ্যামেরিকাকে অন্যান্য আরো ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করা
২) অ্যামেরিকার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়া
৩) অ্যামেরিকার জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট করে দেয়া। নব্বইয়ের দশকের শুরু দিকেও মুজাহিদিনরা বিশ্লেষণ করেছিলেন কোন কোন ভূখণ্ডে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে বিজয়ের সম্ভাবনা সবেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে সকল মুজাহিদিন একমত হন এ ভূখন্ডগুলো হল লিবিয়া, সোমালিয়া, আশ-শাম এবং আফগানিস্তান [এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা, শাইখ আবু মুসাব আস-সুরির আল মুক্বাওয়ামা/The Global Islamic Resistance Call এ আছে, যার কিছু নির্বাচিত অংশ Inspire ম্যাগাযিনে ছাপা হয়েছে]। একারণে শাইখ উসামা অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে আনতে চেয়েছিলেন।। মজার ব্যাপার হল খোদ আল-ক্বাইদার ভেতরে বেশ কিছু নেতা ৯/১১ হামলার বিরুদ্ধে ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন শূরা সদস্য শাইখ সাইফ আল আদেল হাফিযাহুল্লাহ, শাইখ আব্দুল্লাহ আহমেদ আব্দুল্লাহ ফাকাল্লাহু আশরাহ, সাইদ আল মাসরি রাহিমাহুল্লাহ এবং আবু হাফস আল মৌরিতানি হাফিযাহুল্লাহ। তবে মুর’জিআ পন্থী সালাফি এবং হিকমতের আতিশয্যে শয্যশায়ী হেকমতীদের মতো তাদের এই বিরোধিতা কুফফারের এর রক্তপাতের ইস্যুতে ছিল না। বরং তাদের বিরোধিতার কারণ ছিল, ইমারাতে ইসলামিয়্যার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের শংকা। এটা নিশ্চিত ছিল ৯/১১ এর আক্রমণের পর অ্যামেরিকা তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করবে। আর এর অবধারিত ফল হবে ইমারাতের পতন। এ কারণে এই শাইখগণ এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। শাইখ আবু মুসাব আস-সুরি ও তার লেখায় এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছেন এই একই কারণে। তাদের মত ছিল, এই আক্রমণের জন্য ইমারাতের পতন অনেক বেশি চড়া দাম হয়ে যায়।
কিন্তু শাইখ উসামা ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। এই আক্রমণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় কাজ করছিল। বিভিন্ন শূরা সদস্যদের বিরোধিতার পরও, তিনি তানজীমের আমীর হিসেবে এই আক্রমণের নির্দেশ দেন।
৯/১১ এর হামলা পুরো পৃথিবীর দৃশ্যপট বদলে দেয়। পৃথিবী জুড়ে মুসলিম উম্মাহর যুবকদের এই হামলার মাধ্যমে আল্লাহ্* জাগিয়ে তোলেন। এই হামলার মাধ্যমে শুরু জিহাদের এক দাবানল যা ছড়িয়ে পড়ে মাগরিব থেকে মাশরিখ পর্যন্ত। ৯/১১ এর আগে যে আল-ক্বাইদা এবং যে জিহাদ ছিল আফগানিস্তানে সীমাবদ্ধ, ৯/১১ এর পরে তা ছড়িয়ে পড়ে,

সারা বিশ্বে। জ্যামিতিক হারে আল-ক্বাইদা এবং বৈশ্বিক জিহাদ বিস্তৃতি লাভ করে। শাইখ যে তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছিলেন তার প্রতিটি অর্জিত হয়।
১) অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে এক দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যা আজ প্রায় ১৫ বছর ধরে চলছে। এবং অ্যামেরিকা এই যুদ্ধে প্রয়াজিত হয়েছে।
একই সাথে অ্যামেরিকা ইরাকেও অনেক আগেই পরাজিত হয়েছে। আর এখন পৃথিবীর কোথাও সরাসরি মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে নিজেদের সেনা পাঠাতে অ্যামেরিকা নারাজ। যেকারনে শামে এতো কিছু ঘোটে যাবার পরও অ্যামেরিকা সেখানে সেনা পাঠাচ্ছে না।
২) অ্যমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক ধস নেমেছে যার শুরু হয়, ২০০৭-০৮ এ। এসময় অ্যামেরিকার জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। আর ২০০১ থেকে ২০০০৭-০৮ পর্যন্ত আল-ক্বাইদার বিরুদ্ধে “সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে” অ্যামেরিকার মোট ব্যয়ের পরিমাণ? ১.৩ ট্রিলিয়ন ডোলার। অর্থাৎ অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় সরাসরি আল-ক্বাইদার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের ফল।
৩) অ্যামেরিকার রাজনৈতিক ঐক্য আজ সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। ডেমোক্রেট-রিপাবলিকান কেউই আর ক্ষুদ্র দলীয় আর ইহুদী লবির স্বার্থ ছাপিয়ে দেশের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। অ্যামেরিকার জনগণ বাপকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। বাল্টিমোর, অরিগন, নিউ জার্সি ইত্ত্যাদি শহরগুলোটে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া আন্দোলন গুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, জনগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি ক্ষুব্দ হয়ে উঠেছে। অ্যামেরিকার মানুষ আর রাষ্ট্রকে নিজেদের বঁধু মনে করছে না। এই অবস্থায় অ্যামেরিকার সামরিক সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারিত হচ্ছে জাতীয় রাজনীতির জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে, পরকৃত পক্ষে যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে না। এর ফলে মুজাহিদিনের জন্য বিভিন্ন সু্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
সর্বোপরি জিহাদ ও খিলাফতের ডাক আজ সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। শাইখ উসামা সঠিক প্রমানিত হয়েছেন । উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হরমুযানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পারস্য সাম্রায্যকে হারাতে হলে কি করনীয়। ধুর্ত হরমুযান পারস্য সাম্রাজ্যকে পাখির সাথে তুলনা করে বলেছিল, কোন একটি পাখাতে আক্রমণ করতে। কিন্তু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন – পাখির মাথা কেটে ফেলাই যথেষ্ট। শাইখ উসামার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমরা এই বিচক্ষণতার চিহ্ন খুজে পাই। শাইখ মুজাহিদিনের সীমিত সামর্থ্যকে এদিক-সেদিক আক্রমণে কাজে না লাগিয়ে, তা কাজ লাগিয়েছিলেন সাপের মাথায় আঘাত করার জন্য। আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, শাইখের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। আর

একারনেই আমরা এই মানহাজকে উসামার মানহাজ বলে আখ্যায়িত করছি। আল্লাহ-র ইচ্ছায় উসামার এই অন্যবদ্য কৌশল ছাড়া বৈশ্বিক জিহাদ হয়তো আজ এই পর্যায়ে আসতো না। হয়তো আজ আমরা বাংলাদেশে বসে বৈশ্বিক জিহাদের অংশ হতে পারতাম না। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। একারণে আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল এই শ্রেষ্ঠ মানহাজের অনুসরণ করা। আলাহ আমাদের তাঁর দ্বীনের সৈনিক হিসেবে কবুল করুন এবং শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদিনকে আল্লাহ্* রহমতের চাদর দিয়ে জড়িয়ে রাখুন।

“মুসলিমরা যখন পারস্যসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিল, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হরমুযানের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, কারণ হরমুযান ছিল পারস্যের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। পারস্যবাসীদের আক্রমণ করা সর্বোত্তম কৌশল কি হবে, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা হরমুযানের কাছে জানতে চাইলেন। হরমুযান জবাবে বললোঃ ‘আজকে পারস্য সাম্রাজ্যের তুলনা হল, দুটি ডানা, শরীর এবং একটি মাথার সমন্বয়ে গঠিত একটি পাখির ন্যায়।‘ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, ‘মাথা কোনটা?’ হরমুযান বললোঃ ‘নাহওয়ান্দ’। যে দুটি শক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের দুই ডানা স্বরূপ। হরমুযান সেগুলো সম্পর্কেও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জানালেন। তারপর হরমুযান বললোঃ ‘হে আমীরুল মু’মিনীন, পারস্য সাম্রাজ্যকে কিভাবে পরাজিত করতে হবে, এই প্রশ্নের জবাব হল, ডানা দুটোকে আগে কেটে ফেলুন, তারপর মাথাটাকে সরানো সহজ হয়ে যাবে।‘ উমার রাদ্বিয়াল্লহু আনহু সাথে সাথে বললেনঃ ‘হে আল্লাহ-র শত্রু! তুমি মিথ্যা বলছো। নিশ্চয় আগে মাথা কেটে ফেলতে হবে, তাহলে ডানা দুটোকে সরানো সহজ হবে।‘
গাছ ভূপাতিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমরা কান্ড কাটার কাজ চালিয়ে যাবো। ইন শা আল্লাহ্*, গাছ ভূপাতিত হবার পর, শাখাগুলো আপনাআপনিই মারা যাবে।
আপনারা দেখেছে আফগানিস্তানে রাশিয়ার কি অবস্থা হয়েছে। যখন মুজাহিদিন কমিউনিযমের কান্ড, রাশিয়াকে কাটার দিকে মনোনিবেশ করলেন, কমিউনিযমের গাছ ভুপাতিত হয়ে গেলো। আর তারপর দক্ষিণ ইয়েমেন থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত সকল ডাল-পালা (বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র) মরে গেল। অথচ এই ডালপালাগুলো কাটার ব্যাপারে মুজাহিদিনের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।
বৈশ্বিক জিহাদের দুটি অক্ষ / গতিপথ আছে । একটি হল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জিহাদ , যা হল বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় । আরেকটি হল

আঞ্চলিক পর্যায়ে জিহাদ , যা হল আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে । পূর্বের আলোচনায় আমরা মূলত প্রথম অংশটি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আলোচনা করবো, আভ্যন্তরীন শত্রুর মোকাবেলায় উসামা তথা তানজীম আল-ক্বাইদাতুল জিহাদের মানহাজ কি – তা নিয়ে। এ আলোচনার জন্য, গত দশকে আল-ক্বাইদার আঞ্চলিক শাখাগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা চালাবো। আশা করা যায়, এই আলোচনা থেকে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে জিহাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, কোন ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ, এবং কোন কৌশলগুলো অনুসরণ করা উচিৎ, সে বিষয়ে আমরা কিছুটা ধারণা পাবো। এখানে আমরা, বিশেষ করে তিনটি আঞ্চলিক জিহাদের অঙ্গন – ইরাক, ইয়েমেন এবং শাম নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা AQI [Al Qaidah in Iraq], AQAP [Al Qaeda in the Arabian Peninsula], Jabhat al Nusra [Tandhim al-Qaidah fi BIlad ash-Sham] এবং ISIS/IS [জামাতুল বাগদাদী] এই দলগুলোর কার্যক্রম ও কৌশলের দিকে নজর দেবো। আমরা এখানে AQIM [Al Qaidah in the Islamic Maghrib] নিয়ে আলোচনায় যাবো না, কারণ AQAP এবং AQIM এর গৃহীত কৌশল এবং পরিস্থতির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান, যেকারনে AQAP নিয়ে আলোচনা করাটাই যথেষ্ট হবে।
কেন আমরা এই দলগুলো, তাদের কার্যক্রম, এবং সাফল্য-ব্যার্থতা নিয়ে আলোচনা করছি?আমাদের এই আলোচনা উদ্দেশ্য হল অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যে ভুল ইতিমধ্যে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না করা। কারণ মু’মিন এক গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না। যুদ্ধে লোকবল, অস্ত্রের সংখ্যা ও শক্তি, আর্থিক শক্তির চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কৌশল। এবং বারবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তির সুযোগ যুদ্ধ আপনাকে দেবে না। যুদ্ধ এক নির্মম ও কঠোর শিক্ষক। কিন্তু যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য এই শিক্ষা ফলপ্রসু। একই সাথে এটাও পরিষ্কার করা দরকার, কোন মুজাহিদিন জামা’আ এবং মুজাহিদিন উমারাহ এর সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ। AQI:
AQI হল আল-ক্বায়িদার প্রথম আঞ্চলিক শাখা, যা গঠিত হয় ২০০৩ সালে। এর আমীর ছিলেন শাইখ আবু মুসাব আল যারক্বাউয়ী রাহিমাহুল্লাহ। শাইখ যারক্বাউয়ী তাওহীদ ওয়াল জিহাদ নামের একটি তানজীমের আমীর ছিলেন, যে তানজীমের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন আল মুওয়াহিদ, শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাক্বদিসি হাফিযাহুল্লাহ। পরবর্তীতে শাইখ মাক্বদিসি, ‘ইলমের ক্ষেত্রে গভীরতর মনোনিবেশের জন্য আমীর পদ শাইখ যারক্বাউয়ীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার উপর অর্পণ করেন। ইরাক যুদ্ধের প্রথম বছর তাওহীদ ওয়াল জিহাদ স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করলেও, ২০০৪ এর অক্টোবরে শাইখ যারক্বাউয়ী আনুষ্ঠানিক ভাবে শাইখ উসামা তথা আল-ক্বাইদার কাছে বাইয়াহবদ্ধ হন। তবে আল-

ক্বাইদা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে বাইয়াহবদ্ধ না এমন দল এসময়ে ইরাকে জিহাদরত অবস্থায় ছিল [আনসার আল ইসলাম]। শাইখ যারক্বাউয়ীর বাইয়াহর পর, খুরাসান থেকে বেশ কিছু আল-ক্বাইদা সদস্যকে ইরাকে পাঠানো হয়, শাইখ যারক্বাউয়ীকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করার জন্য। যার মধ্যে শাইখ আবু হামযা আল মুহাজির রাহিমাহুল্লাহ, এবং শাইখ আবু সুলাইমান আল উতায়বী অন্যতম। পরবর্তীতে শাইখ উসামার পরামর্শে AQI কে বিলুপ্ত ঘোষণা করে মুজাহেদীন শূরা কাউন্সিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এটি দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাকে রূপ নেয়।
শাইখ যারক্বাউয়ীর মৃত্যুর পর, দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক নামক ইমারাহর ঘোষণা দেয়া হয়, শাইখ উসামার সাথে আলোচনা না করে, এবং তার সম্মতি ছাড়াই। শাইখ উসামা এই ঘোষনার কথা জানতে পারেন মিডিইয়ার মাধ্যমে। তিনি তখন এক চিঠিতে জানান, যদি ইমারাহ ঘোষণার আগে তার কাছে অনুমতি চাওয়া হতো, তবে তিনি কক্ষনোই তাতে সম্মতি দিতেন না, কারণ ময়দানের বাস্তব পরিস্থিতি ইমারাহ ঘোষণার উপযুক্ত ছিল না। তবে যেহেতু একবার ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে তাই কোন রকম বিভেদ যেন সৃষ্টি না হয়, এবং মুজাহিদিনের ভাবমূর্তি যেন না নষ্ট হয়, সেকারনে তিনি রাষ্ট্র ঘোষণার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। সত্যবাদী শাইখ আইমান আল-যাওয়াহিরি এই কথার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ইমারাহ গঠন এবং তাতে শাইখ উসামার আপত্তি সংক্রান্ত এই পয়েন্টটি গুরত্বপূর্ণ, এবং আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোচনা করবো। আল-ক্বাইদা ইরাককে বিলুপ্ত করে মুজাহেদীন শূরা কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল, ইরাকের জিহাদকে আল-ক্বাইদার জিহাদ হিসেবে চিত্রিত করার পরিবর্তে, ইরাকী জনগণ এবং উম্মাহর জিহাদ হিসেবে চিত্রিত করা। একারণেই যখন দাওলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক গঠিত হয়, তখন শাইখ উসামার কাছে শাইখ আবু উমার আল বাগদাদির বাইয়াহর প্রদান করলেও, মিডিয়াতে এই বাইয়াহর কথা প্রকাশ করা হয় নি। শাইখ আইমান, শাইখ আল-মাকদিসি, এবং শাইখ আবু ক্বাতাদা সহ আরো অনেকে এই বাইয়াহর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। জামাতুল বাগদাদির পক্ষ থেকে অনেক সময় বলা হয় আবু উমার আল বাগদাদী এবং আবু বাকর আল বাগদাদীর কখনো শাইখ উসামা এবং পরবর্তীতে শাইখ আইমানের কাছে বাইয়াহ ছিল না। কিন্তু এটা নির্জলা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই না। মিথ্যাবাদি আদনানীও এক সময় এ সত্য স্বীকার করেছে, যদিও সে এই বাইয়াহর হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছে।
আল ক্বাইদা ইরাকের কিছু যুদ্ধ কৌশলের সমালোচনা শাইখ উসামা শুরু থেকেই করে আসছিলেন। যার মধ্যে তিনটি মূল সমালোচনা ছিলঃ ১) শিরচ্ছেদের ভিডিও প্রকাশ, ২) শি’আদের উপাসনালয়, মার্কেট ইত্যাদি জায়গায় নির্বিচারে হামলা, এবং ৩) সাধারণ মুসলিম, যাদের

মধ্যে অনেক বিদ’আ, গোমরাহি এবং অজ্ঞতা আছে, তাদের প্রতি অতি কঠোরতার কারণে জিহাদকে সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এই ব্যাপারে শাইখ উসামার নির্দেশে শাইখ আইমান, বেশ কয়েকবার শাইখ যারক্বাউয়ীকে চিঠি লেখেন। শাইখ উসামার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল অ্যামেরিকাকে আক্রমণের মূল ফোকাস বানানো। কিন্তু শাইখ যারক্বাউয়ী সিদ্ধান্ত নেন, শি’আদের আক্রমণের মাধ্যমে জিহাদকে একটি শি’আ বিরোধী রূপ দেয়া। এর ফলে শি’আরা যখন আক্রমণ চালাবে, সুন্নিরা বাধ্য হয়েই শাইখ যারক্বাউয়ীকে সমর্থন দেবে। কিছু সময়ের জন্য এই পদ্ধতি সাফল্য পায়। কিন্তু দাওলাতুল ইরাক গঠনের পর, আনবারের গোত্রগুলোর সাথে দাওলাহ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, জিহাদ জনসমর্থন হারিয়ে ফেলে, এবং অ্যামেরিকা এটা সুচারু ভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে।
মূলত আল ক্বাইদা ইরাক এবং পরবর্তীতে দাউলাতুল ইরাকের নীতি ছিল অনেকটা “একলা চলো রে” ধরণের। তারা সর্বদা, অধিক শোরগোল হয় – আক্ষরিক এবং মিডিয়াগত ভাবে – এমন অপারেশান এবং ঘোষণার দিকে অনুরক্ত ছিল, এবং তাৎক্ষণিক বিজয়কে দীর্ঘমেয়াদী বিজয়ের উপরে প্রাধান্য দিতো। এছাড়া এক্সক্লুসিভলি সামরিক টার্গেটে হামলার পরিবর্তে বেসামরিক “সফট টার্গেটে” হামলা করার প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। আর তারা ঢালাওভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিল যা তাঁদেরকে সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পরবর্তীতে জামাতুল বাগদাদী এই সবগুলো বৈশিষ্টকে গ্রহণ করে এবং এগুলোর তীব্রতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আর যে তিনটি সমালোচনা শাইখ উসামা করেছিলেন, সেগুলো ব্যাপকভাবে তারা গ্রহণ করেছে। একারণে আল-আদনানী যদিও একজন মিথ্যাবাদী, কিন্তু যখন সে বলেছিল “ এ আমাদের মানহাজ নয়” তখন সে সত্যই বলেছিল। ওয়াল্লাহি – নিশ্চয় উসামার মানহাজ , আর আল বাগদাদীর মানহাজ এক না । নিশ্চয় তানজীম আল - ক্বাইদাতুল জিহাদ আর জামাতুল বাগদাদীর মানহাজ এক না । উসামা এবং তানজীম আল - ক্বাইদাতুল জিহাদের উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে জিহাদের জন্য সমর্থন সৃষ্টি করা , এবং উম্মাহকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা । আর জামাতুল বাগদাদীর উদ্দেশ্য হল , উম্মাহকে তাকফির করা এবং জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা । হয় আমাদের সাথে , অথবা আমদের বিরুদ্ধে – বুশের এই মানহাজই হল আল - বাগদাদীর জামা ’ আর মানহাজ । AQAP:
আনুষ্ঠানিক ভাবে AQAP গঠিত হয় ২০০৯ সালে, আল-ক্বাইদা ইন ইয়েমেন এবং আল-ক্বাইদা ইন বিলাদুল হারামাইন এর একীভূতীকরনের মাধ্যমে। শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরী রাহিমাহুল্লাহ নেতৃত্বে ২০০১ এর পর বিলাদুল হারামাইন এবং ইয়েমেনে আল-ক্বাইদার কিছু সক্রিয় সেল গড়ে ওঠে, পরবর্তীতে এগুলোই একীভূত হয়ে AQAP গঠন করে। AQAP এর

প্রথম আমীর ছিলেন শাইখ আবু বাসীর নাসির আল -উহায়শী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি তানজীম আল-ক্বাইদার নায়েবে আমীরও ছিলেন। বর্তমানে AQAP এর আমীর হলেন শাইখ আবু হুরায়রা ক্বাসিম আর -রাইমি হাফিযাহুল্লাহ। বিশিষ্ট শাইখ এবং আমাদের সবার প্রিয়, ইমাম আনওয়ার আল-আওলাক্বি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন AQAP এর সদস্য। তবে তিনি এর আমীর ছিলেন না। শাইখ নাসির আল উহায়শী, শাইখ উসামার কাছে একটি চিঠি লিখে শাইখ আওলাকীকে AQAP এর আমীর বানানোর প্রস্তাব দেন, কিন্তু শাইখ উসামা বলেন, শাইখ আওলাকীর ব্যাপারে অনেক প্রশংসা এবং উত্তম কথা তার কানে এসেছে, যদি আল্লাহ্ * সুযোগ দেন তিনি শাইখ আওলাকীর সাথে মুখোমুখি কথা বলতে আগ্রহী, কিন্তু আমীর বানানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনি শাইখ আওলাকী আরো পর্যবেক্ষন করার পক্ষপাতী [সূত্র অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস]।

এখান থেকে তানজীম আল-ক্বাইদার নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি রকম শক্ত এবং অনমনীয় নিয়ম গৃহীত হয়, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। শাইখ আওলাকীর ব্যাপারে শাইখ উসামার কোন বিশেষ সন্দেহ ছিল না। না তার যোগ্যতা সম্পর্কে উমারাহদের মধ্যে সন্দেহ ছিল। কিন্তু যেহেতু শাইখ আওলাকী ছিলেন ময়দানের জিহাদে তুলনামূলকভাবে নতুন, তাই শাইখ উসামা, শাইখ আওলাকীকে তখনি আমীর না বানিয়ে, শাইখ নাসির আল উহায়শীকে আমীর পদে থাকার নির্দেশ দেন। এখান থেকে আমাদের ভাইদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপার আছে। শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত যোগ্যতাই যদি একমাত্র মাপকাঠি হতো তাহলে শাইখ আওলাকিকে আমীর না বানানোর কোন কারণ আপাতদৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকাই যথেস্ট না। প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, আনুগত্য মেনে কাজ করার উপযোগী মানসিকতা, তাযকিয়্যাহ এবং কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করা। আমাদের দেশে যোগ্য ভাইদের অভাব নেই আলহামদুলিলাহ - কিন্তু দুঃখজনক ভাবে আমরা দেখি, আনুগত্য মেনে কাজ করার লোকের অভাব। আমাদের এ ব্যাপারটা ভালো ভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নেয়া উচিৎ যে, আমাদের যার যে যোগ্যতাই থাকুক না কেন, আমরা সবাই হলাম আল্লাহ ও তার রাসূল এর নগন্য সৈন্যমাত্র। আমাদের চারপাশের বলয়ের প্রেক্ষিতে হয়তো আমাদের নিজেদের অনেক যোগ্য মনে করছি, কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা উচিৎ, এই তানজীম পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জিহাদ চালিয়ে আসা, বিভিন্ন তানজীমের সব চাইতে মেধাবী, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ উমারাহ এবং উলামার দ্বারা, যারা চার -পাঁচ দশক ধরে ময়দানে জিহাদ করে আসছেন। অতএব, চারপাশের মানুষের মাপকাঠিতে নিজের যোগ্যতা না মেপে আমাদের উচিৎ এই মানুষগুলোর তুলনায়, আমার বা আপনার সামরিক কিংবা কৌশলগত মতামত বা পরিকল্পনার ওজন কতটুকু, তা মাপা। একইসাথে আমাদের এটাও স্মরণ করা উচিৎ, আমাদের

অনেক আপাতদৃষ্টিতে যোগ্য ভাইদের কথা AQAP এর ম্যাগাযিন ইন্সপায়ারে আসেনি। আমাদের অনেক আপাতদৃষ্টিতে বিচক্ষণ ভাইদের কথা আল-নুসরার ভাইদের মধ্যে আলোচিত হয় নি। বরং ইন্সপায়ারে কথা বলা হয় আমাদের সেসব নাম না জানা ভাইদের কথা, যারা শুনেছেন এবং মেনেছেন, এবং আল্লাহ্* তাদের মাধ্যমে আল্লাহ-র শত্রু এবং আমাদের শত্রু অভিজিৎ, নিলয়, ওয়াশিকুরদের হত্যা করেছেন। AQAP এর সম্মানিত শাইখ, আমাদের অনালাইনে লেখালেখির কারনে তুমুল জনপ্রিয় কোন ভাইয়ের মতো হবার ইচ্ছে ব্যাক্ত করেন নি, বরং তিনি ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন, আফসোস করেছেন, ফয়সাল বিন নাইম দ্বীপ, জিকরুল্লাহ আর আরিফুলের মতো হবার জন্য। আল্লাহ্* আমাদের সকলকে এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার এবং অনুধাবন করার তাউফীক্ব দান করুন।
ফিরে যাই AQAP-র কথায়। আল-ক্বাইদা ইন ইরাকের ভুল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ইয়েমেনে প্রয়োগ করা হয়। ২০১১ সালের গৃহযুদ্ধের সময় আল-ক্বাইদা ইন ইয়েমেন আদেন প্রদেশের বিশাল অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়, এবং সেখানে শারীয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই কাজগুলো আল-ক্বাইদার ব্যানারের পরিবর্তে আনসার আশ-শারীয়াহর ব্যানারে করা হয়। যখন দেখা গেল মুরতাদ ও কাফিররা ব্যাপকভাবে আদেনে হামলা চালাতে যাচ্ছে, যার ফলে সাধারণ মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হবে, তখন আনসার আল-শারীয়াহ আদেনের নিয়ন্ত্রন ছেড়ে দেয়। এছাড়া ২০১৫তে আল-ক্বাইদা মুকাল্লা দখল করে নেয়। মুকাল্লার মূল ব্যাংক থেকে ট্রাকে করে টাকা উঠিয়ে নিয়ে আল-ক্বাইদা মুসলিম জনগণের মধ্যে বিতরণ করে। যখন ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়, তখন সরকারি বিশাল বিশাল অফিস এবং গভর্নরদের রাজকীয় বাসভবনগুলোকে আল-ক্বাইদা সাধারণ মুসলিম জনগণের আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। মুকাল্লাতেও আল-ক্বাইদা নিয়ন্ত্রন গ্রহনের পর, সরাসরি নিজেদের নিয়ন্ত্রনে না রেখে, শাসনভার Sons of Hadhramaut/হাদরামাউতের সন্তানেরা নামে একটি কোয়ালিশনের কাছে অর্পণ করে। ২০১১ সালে এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে বেশ কয়েকবার ইয়েমেনে ইমারাহ ঘোষণার গুজব শোনা গেলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে কখনোই এরকম কিছু বলা হয় নি। বরং আল –ক্বাইদা ইয়েমেনের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে তারা একটি গেরিলা দল, মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত একটি দল, অন্য মুসলিমদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং তারা তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলে সাধ্যমতো শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়।
এসব কৌশলের ফলে আল-ক্বাইদা ইয়েমেনে, বিশেষ করে দক্ষিণ ইয়েমেনে ব্যাপক জনসমর্থন উপভোগ করে। আনসার আশ-শারীয়াহর বিরুদ্ধে আমেরিকার হামলাকে সাধারণ জনগণ নিজেদের উপর হামলা বলেই গণ্য করে। একই সাথে এটাও লক্ষণীয়, আর সব আল-ক্বাইদা শাখার মধ্যে

ইয়েমেনের শাখাটিই আমেরিকার উপর হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এ থেকে এ সত্যেরই প্রমাণ মেলে, সাধারণ মুসলিম জনগণের সমর্থনপুষ্ট একটি স্থিতিশীল ঘাঁটি পশ্চিমা দেশগুলোতে, বিশেষ করে আমেরিকাতে হামলা চালানোর জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। ইয়েমেনের এই শাখার ব্যাপারে আরেকটি গুরত্বপূর্ণ তথ্য হল, রাসূলুল্লাহ হাদিসে বর্ণিত আদান-আবইয়ানের ১২,০০০ সৈন্যের বাহিনী তৈরির কাজ এই দল করে যাচ্ছে।

জাবহাত আল-নুসরাঃ

আল-ক্বাইদা ইন ইরাকের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সে ব্যাপারে আঞ্চলিক শাখাগুলোকে সতর্ক করার ব্যাপারে বারবার শাইখ উসামা তৎকালীন নায়েবে আমীর শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিব্বির কাছে চিঠি পাঠান। তিনি বারবার আঞ্চলিক শাখাগুলোর জন্য একটি লিখিত দিকনির্দেশনা বা গাইডলাইন তৈরির তাগাদা দেন। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় হাকীমুল উম্মাহ শায়েখ আইমান আল-যাওয়াহিরি লিখিত 'জিহাদের সাধারণ নির্দেশনাবলী'। এই ফোরামের ভাইরা নিশ্চিত ভাবেই এই লেখার সাথে পরিচিত। যাদের এখনো পড়ার সুযোগ হয় নি তারা অবশ্যই এটা পড়ে নেবেন, এবং আত্বস্থ করবেন। এই লেখাতে হামলার টার্গেট নির্ধারণ এবং দাওয়াহর ব্যাপারে কিছু মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে যার অনুসরণ স্থানীয় পরিসর এবং আন্তর্জাতিক পরিসর, উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এ দিকনির্দেশনায়, আন্তর্জাতিক ভাবে হামলা, অর্থাৎ অ্যামেরিকান টার্গেটে হামলা, কিংবা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অন্য কোন পশ্চিমা টার্গেটে হামলা আর স্থানীয় জিহাদের ক্ষেত্রে হামলার জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের জন্য কিছু মুল্যবান এবং মৌলিক পার্থক্য করা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে হারবি কুফফার, বিশেষ করে অ্যামেরিকার, সামরিক-বেসামরিক যেকোন টার্গেটে হামলা করা উৎসাহিত করা হয়েছে। হতে পারে সেটা বোস্টন হামলার মতো "সফট টার্গেটে", কিংবা ফোর্ট হুডে নিদাল হাসানের হামলার মতো, সামরিক টার্গেটে। ইন্সপায়ার ম্যাগাযিনের মাধ্যমেও এ বার্তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে অবস্থিত কুফফারদের বিরুদ্ধে হামলার ক্ষেত্রে কিংবা তাগুতের সেনাদের বিরুদ্ধে হামলার ক্ষেত্রে সফট টার্গেট এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে যাতে করে এতে মুসলিমদের কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়। এ কারণে প্যারিসে জামাতুল বাগদাদীর হামলার কৌশল বিরোধিতা আমরা করি না, বরং প্রশংসা করি। কিন্তু জাকার্তা কিংবা ইস্তানবুলে বোমা হামলার কৌশলগত সমর্থন আমরা করি না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করতে পারেন, অভিজিৎ জনসম্মুখে কুপিয়ে মারা আমরা সমর্থন করি, কিন্তু যদি অভিজিৎকে মারার জন্য বইমেলাতে বোমা হামলা হতো তবে কৌশলগত দিক থেকে তা সমর্থনযোগ্য

না, কারণ এতে করে সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
এ গাইডলাইনের সবচেয়ে সুচারু বাস্তবায়ন আমরা দেখি তানজীম আল-ক্বাইদা ফিল বিলাদ আশ- শাম বা জাবহাত আল-নুসরার কাজের মধ্যে। আনুষ্ঠানিক ভাবে জাবহাত আল নুসরার কার্যক্রমের শুরু ২০১২ সালে। সিরিয়াতে বাশার বিরোধী জিহাদ শুরুর পর, শাইখ আইমান আল যাওয়াহিরির নির্দেশে আবু বাকর আল-বাগদাদি, শাইখুল ফাতিহ আবু মুহাম্মাদ আল জাওলানী সহ কয়েকজনকে সিরিয়াতে পাঠান সিরিয়াতে আল-ক্বাইদার একটি শাখা গড়ে তোলার জন্য। শাইখ আল জাওলানী সহ মোট ছয়জন ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে জাবহাত আল-নুসরা। বাগদাদীর পক্ষ থেকে জাবহাত আল নুসরার জন্য সাহায্য ছিল প্রথম দিকের আর্থিক সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অল্প দিনের মধ্যেই আসাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর, দুঃসাহসী এবং সামরিক ভাবে দক্ষ বাহিনী হিসেবে জাবহাত আল নুসরা পরিচিত হয়ে ওঠে। ২০১৩ সালে আবু বাকর আল বাগদাদী দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাককে দাওয়ালাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক আশ-শামের রূপান্তরের ঘোষণা দেন। শাইখ জাওলানী এই ঘোষণার বিরোধিতা করেন, এ ধরণের সিদ্ধান্ত শামের জিহাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, এই যুক্তিতে। তিনি বলেন, যেহেতু তার এবং বাগদাদী দুজনেরই আমীর শাইখ আইমান তাই তিনি এই সিদ্ধান্তের ভার তার উপর অর্পণ করছেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তাই শাইখ জাওলানী মেনে নেবেন। এর আগ পর্যন্ত জাবহাতুন নুসরাহর আল-ক্বাইদার সাথে সম্পৃক্ততার কথা গোপন রাখা হয়েছিল। বাগদাদীও শাইখ আইমানের কাছে একটি চিঠি লেখে, এবং শাইখ জাওলানীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বিচারের দায়িত্ব শাইখ আইমানের উপর ন্যস্ত করে। পরবর্তীতে শাইখ আইমান শাইখ জাওলানীর পক্ষে রায় দেন, নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত না যাওয়ায় বাগদাদী তার আমীরের অবাধ্য হয়, এবং বাইয়াহ ভঙ্গ করে।
জাবহাতুন নুসরা শুরু থেকে “জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা” মেনে চলার চেষ্টা করে। এর ফলে তারা সিরিয়ান জনগণের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে। শামের সাধারণ জনগণ জাবহাতুন নুসরাকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। সমগ্র বিশ্ব থেকে জাবহাতুন নুসরার সাথে সম্পর্কছেদের জন্য চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, প্রকৃত ভাবে ইসলামের জন্য লড়াই করছে এবং কোন জামা’আ জাবহাতুন নুসরার সাথে সম্পর্ক ছেদে রাজি হয় নি। আননুসরা গভীরভাবে শামের জনগণ এবং শামের জিহাদের মধ্যে নিজেদের প্রোথিত [Embed] করতে সক্ষম হয়েছে। যে কারনে, বাশার-ইরান-হিযবুল্লাত-রাশিয়া- অ্যামেরিকা সব পক্ষই মূল হুমকি মনে করে, জাবহাতকে। এর প্রমাণ হল, অনেক ক্ষেত্রেই বাশারের সেনাদল এবং জামাতুল বাগদাদীর সেনারা পাশপাশি অবস্থান করেছে [যেমন হাসাকাহ] কিন্তু একে অপরকে আক্রমণ করে নি। অনেক ক্ষেত্রেই দুই দিক থেকে বাশার/হিযবুল্লাত

এবং জামাতুল বাগদাদী জাবহাতুন নুসরাকে আক্রমণ করেছে [যেমন ক্বালামুন, এবং দেইর আয যুর]। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রাশিয়ান জেট জাবহাতের উপর বোমা ফেলছে আর দুই দিক থেকে বাশার-বাগদাদীর সেনা আক্রমণ করছে [যেমন আলেপ্পো।]। কেন রাশিয়া-ইরান-হিযবুল্লাত-বাশার-অ্যামেরিকা জাবহাতকে মূল হুমকি মনে করে কিন্তু মিডিয়াতে ক্রমাগত জামাতুল বাগদাদীর বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা বলে? এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে।
– জামাতুল বাগদাদীর কোন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু শামে যদি কোন সমঝোতায় আসতে হয় তাহলে আল-নুসরাকে বাইরে রাখা যাবে না। তাই যদি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যায় তাহলে, কাফির ও রাফিদ্বাদের মনমতো এক সমঝোতা করা সম্ভব, যা আল নুসরা টিকে থাকলে সম্ভব না।
-যারা বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, জামাতুল বাগদাদী তাঁদেরকে আক্রমণ করছে, এবং হত্যা করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জামাতুল বাগদাদী বাশারের কাজকে সহজ করে দিচ্ছে। বাশার বিরোধী জিহাদকে বিভক্ত করছে। জামাতুল বাগদাদীর কারণে আগে যে দলগুলো তাদের সবগুলো বন্দুকের নল বাশারের দিকে ঘুড়িয়ে রেখেছিল, তারা এখন অর্ধেক নল নিজেদের আত্বরক্ষার জন্যই বাগদাদীর দিকে ঘুড়াতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া এমন সব উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ নেতাকে বাগদাদীর সেনারা খুজে খুজে হত্যা করছে, যাদের নাগাল বাশারের সেনারা পাচ্ছিলো না। বাগদাদীর টীকে থাকার অর্থ বাশারের বিরোধীদের শক্তিক্ষয় হওয়া।
-অন্যদিকে বাগদাদীর দলের পক্ষে বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক, এমনকি সিরিয়ার জনগণের, এবং বাগদাদীর নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলের মুসলিমদেরই কোন সমর্থন নেই। তাই একবার সব বাশারবিরোধী দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে, বাগদাদীর দলের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধ করে তাদের মুছে ফেলা কঠিন কিছু না। কিন্তু জাবহাত সিরিয়ার সব দলকে বাশারের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে চায়। তাদের আছে ব্যাপক জনসমর্থন এবং আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিমদের সমর্থন। একারণে তাদের সরানো অধিক লাভজনক।
-সিরিয়াতে জামাতুল বাগদাদীর চেইন অফ কমান্ড হল মূলত ইরাকিদের দ্বারা গঠিত। যাদের সিরিয়ার জনগণ এবং সমাজের সাথে গভীর সম্পর্ক নেই। একারণে তাদের সিরিয়া থেকে উপরে ফেলা সহজ।
– জামাতুল বাগদাদীর ক্ষমতা প্রপাগ্যান্ডা নির্ভর, ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রচার করা। তাদের অধীনে থাকা অধিকাংশ অঞ্চল হল জনবিরল মরুভূমি। আর জাবহাতের কৌশল হল তাদের ভূমিকা এবং ক্ষমতা ছোট করে দেখানো। তারা এমন সব জায়গা নিয়ন্ত্রন করে যেগুলো কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ইদলিব।

-জামাতুল বাগদাদী একসাথে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বসে আছে। কিন্তু আল-নুসরা কৌশলগত কারণে একটি, একটি করে শত্রু নিধনের নীতি গ্রহণ করেছে। আর সু্যোগের সদ্ব্যবহার করছে। যেমন জামাল মারুফের সেক্যুলার SRF এর বিরুদ্ধে জামাতুল বাগদাদী অনেক হাকডাক করেছে কিন্তু তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। আর নুসরা তাদের ব্যাপারে চুপ থেকেছে, কিন্তু সু্যোগ পাওয়া মাত্রই, SRF কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এবং একাজের পর জনগণের সমর্থনও পেয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে হারকাত হাযমের ব্যাপারেও। একারণে শাম পশ্চিমা পরিকলনা বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি আল-নুসরা। -জামাতুল বাগদাদী দমনের কথা বলে সিরিয়া আক্রমণ করার পলিসি পশ্চিমাদের গেলানো যতোটা সহজ, জাবহাত আল নুসরাকে আক্রমণ করার কথা বলে তা করা অতোটা সহজ না।
জাবহাত আল-নুসরার সবচেয়ে বড় সফলতা হল নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে সিরিয়ার সমাজ এবং শামের জিহাদের মধ্যে প্রোথিত করতে সক্ষম হওয়া। আর এটা সম্ভব হয়েছে মূলত এই সাধারণ দিকনির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে। ২০১৪ সালে একটি লিকড অডিও বার্তায় শামে একটি সম্ভাব্য ইমারাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শাইখ জাওলানীর মুখ থেকে শোনা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে জাবহাত আল নুসরার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, এই মুহূর্তে কোন ইমারাহ ঘোষণার পরিকল্পনা তাদের নেই।
গেরিলা যুদ্ধের দুটি পদ্ধতিঃ
AQAP, জাবহাত আল নুসরা এবং জামাতুল বাগদাদীর কৌশলের দিকে তাকালে গেরিলা যুদ্ধের দুটি মডেলের উদাহরণ দেখা যায়। প্রথমটি হল, জনসমর্থন কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে সামরিক শক্তির চেয়ে রাজনৈতিক শক্তিকে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের প্রোথিত করাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। একে মাওইস্ট গেরিলা ডকট্রিনও বলা হয়। আধুনিক কালে যতগুলো গেরিলা যুদ্ধ সফল হয়েছে, মাও সে তুং কৃষক বাহিনী থেকে শুরু করে, ভিয়েতনামের ভিয়েতকং, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ, অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ – এসবগুলোতেই মাওইস্ট গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসৃত হয়েছে। এ ধরণের যুদ্ধের একটি মূলনীতি হল জনগণের সাথে গেরিলা যোদ্ধার গভীর সম্পৃক্ততা। একে মাও সে তুং বর্ণনা করেছিল এভাবে
– জনগণ হল পানি যার মধ্যে গেরিলরূপী মাছ সাঁতরে বেড়ায়। একই কথা শাইখ উসামা এবং শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিব্বির কথায় বারবার ফুটে উঠেছে। জনসমর্থন ব্যাতীত মুজাহিদিনের অবস্থা হবে পানি ছাড়া মাছের মতো, যার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব না। এজন্য সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি জনসমর্থন তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে তা সামরিক সক্ষমতার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি [অর্থাৎ মুজাহিদিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জনসমর্থন] ছাড়া গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং অপারেশান চালানোর মতো সক্ষমতা অর্জন দুঃসাধ্য। সহজ ভাষায় মুজাহিদিনের কার্যক্রম সুচারু ভাবে চালানোর জন্য একটি নিরাপদ ঘাঁটি দরকার, যেখানে থেকে গিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তারা পুনরায় সেখানে ফিরে এসে সংগঠিত হতে পারবে। চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধের পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে, এরকম সমর্থন তৈরির মাধ্যমে শক্তি, সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যারা শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের দাওয়াহ -ইদাদ -রিবাত -ক্বিতালের পর্যায়ক্রমিক মডেলের ব্যাপারে পড়েছেন, তাদের কাছে মাওইস্ট গেরিলা ডক্ট্রিনের সাথে শাইখ আব্দুলাহ আযযামের মডেলের সাদৃশ্য পরিষ্কার ফুটে উঠবে। এ মডেল অনুযায়ী সামরিক কার্যক্রম শুরুর আগে, "জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করা", তারপর "আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক বা আদর্শিক ঐক্য গঠন" অপরিহার্য। এপর্যায়ের পর আসবে ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসারের একটি পর্যায়, এবং তারপর আসবে চূড়ান্ত পর্যায়, যা হল চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ এবং শত্রুর ধ্বংস।

অর্থাৎ মাওইস্ট মডেলের ধাপগুলো হচ্ছেঃ

১।জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করা
২।আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক বা আদর্শিক ঐক্য গঠন
৩।ক্রমান্বয়ে
৪।চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ এবং শত্রুর ধ্বংস

আর শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যে ধাপগুলোর কথা বলেছেনঃ

১।দাওয়াহ
২।ইদাদ (প্রস্তুতি)
৩।রিবাত (সীমান্ত প্রতিরক্ষা)
৪। ক্বিতাল

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আমরা এক কাফিরের তৈরি মডেল অনুসরণ করবো? এক্ষেত্রে উত্তর হবে, আমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে কাফিরের কাছ থেকে গ্রহণ করছি না, গ্রহণ করছি রণকৌশলের ক্ষেত্রে। খোদ রাসূলুল্লাহ এমনটা করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়, যখন তিনি , সালমান আল ফারেসি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে খন্দক খনন করেছিলেন, যা ছিল পারস্যবাসীর একটি রণকৌশল। এছাড়া আমরা যদি হিজরতের পরের সারিয়্যার দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায়, গাযয়াতুল বদরের আগে ও পরের অধিকাংশ সারিয়্যাই ছিল আক্রমণ ও পশ্চাৎপসরনের, যাকে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের ভাষায় "হিট অ্যান্ড রান" [Hit & Run] আক্রমণ বলা হয়। আরেকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি ছিল আল-ইঘতিয়াল বা গুপ্তহত্যার – যার সফল ব্যবহার, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বাংলাদেশে দেখেছি। এছাড়া আমরা দেখি আবু

বাসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্বুরাইশের বাণিজ্য কাফেলার বিরুদ্ধে যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন তার জন্য তিনি একটি নিরাপদ ঘাঁটি/সেফ যোন এবং “হিট অ্যান্ড রান” পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।
আল-ক্বাইদা কতৃক এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়, আরব বসন্তের পরবর্তী অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। আরব বসন্তের সময় যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়, তার সু্যোগে আল-ক্বাইদা এমন সব জায়গায় তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করে, যেসব অঞ্চলে পূর্বে তাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল না। যেমন তিউনিসিয়া, মিশর এবং লিবিয়া। এখানে উল্লেখ্য এসব অঞ্চল থেকে বেশ কিছু দল জামাতুল বাগদাদীকে বাইয়াহ দিয়েছে এটা সত্যি, তবে জামাতুল বাগদাদী এই দলগুলোর কোনটিই গড়ে তোলেনি। বরং এদলগুলোর সবগুলোই ছিল আল-ক্বাইদার সাথে কোন না কোন ভাবে সম্পৃক্ত। পরবর্তীতে জামাতুল বাগদাদীর সাফল্য দেখে, এবং সামরিক ও আর্থিক সহায়তার আশ্বাসের কারণে কিছু দল তাদেরকে বাই’য়াহ দেয়। কিন্তু একটা অনস্বীকার্য খোদ ইরাক থেকে শুরু করে, যে জায়গাতেই জামাতুল বাগদাদীর সম্প্রসারণ ঘটেছে কোন একটি জায়গাতে তারা জিহাদের ফিল্ড তৈরি করে নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল-ক্বাইদা ফিল্ড তৈরি করেছে, আর তার পর জামাতুল বাগদাদী সেটার সু্যোগ নিয়েছে।
এছাড়া আল-ক্বাইদার ব্যবহৃত আরেকটি কৌশল হল গোপনে নিজেদের প্রসার ঘটানো, বৃদ্ধি, বিভিন্ন দলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা গোপন করা, এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে প্রচারে না যাওয়া। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল-ক্বাইদা চায় সবাইকে বোঝাতে যে, তারা কোথাও নেই। জামাতুল বগাদাদী চায়, সবাইকে বোঝাতে যে তারা সব জায়গায় আছে। বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ততা গোপন করার ব্যাপারে শাইখ উসামার যুক্তি ছিল- যখনই আল-ক্বাইদার সাথে কোন দলের সম্পৃক্ততার প্রকাশ পায় তখনই তাদের বিরুদ্ধে কুফফারের আক্রমণ বেড়ে যায়। এ কারণে এটা গোপন রাখাই উত্তম।
গেরিলা যুদ্ধের অন্য পদ্ধতিটিকে বলা হয় ফোকোইস্ট ডক্ট্রিন। এ পদ্ধতির প্রবক্তা হল চে গুয়েভারা। এ পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া সফল গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে জনসমর্থন প্রয়োজন তা সহিংসতার মাধ্যমেই তৈরি করা সম্ভব। গুয়েভারা মাও সে তুং-এর মডেলকে মূলত উলটে দেয় এবং এই মত প্রচার করে, যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করা হবে, সহিংসতা চালানো হবে, তখন আপনাআপনি মানুষের মধ্যে বিপ্লব-বিদ্রোহ-জাগরন সৃষ্টি হবে। জামাতুল বাগদাদী এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছে। তারা সমর্থন সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে সহিংসতার ব্যবহারে বিশ্বাসী, যা তাদের হলিউড ধাঁচের হরর ফিল্ম ধরণের ভিডিও গুলো থেকে প্রতিভাত হয়। মজার

ব্যাপার হল, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উচ্চজীবিত ইরাকি বা’থ পার্টিও এই ফোকোইস্ট মডেলে বিশ্বাসী ছিল। জামাতুল বাগদাদীর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী সাফল্যকে গুরুত্ব দেয়, যদি এই স্বল্পমেয়াদী সাফল্যকে মিডিয়া প্রপাগ্যান্ডার কাজে লাগানো যায়। ফোকোইস্ট ধারার একমাত্র সফল প্রয়োগ হয়েছে কিউবাতে। এছাড়া কঙ্গো, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা এবং কলম্বিয়া সব জায়গাতেই এ ধারা ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র কলম্বিয়াতে ফার্ক এখনো টিকে আছে, তবে তারা আদর্শিক গেরিলা বাহিনীর বদলে, বর্তমানে কোকেন ব্যাবসায়ী একটি মিলিশিয়াতে পরিণত হয়েছে।
একথা ধরে নেয়া ভুল হবে যে আল-ক্বাইদা বা জামাতুল বাগদাদী পুরোপুরি মাওইস্ট বা ফোকোইস্ট গেরিলা যুদ্ধের মডেল অনুসরণ করে। বরং এটা বলাই অধিক সঠিক যে দুটি দলই এ দুটোর মডেলের মিশ্রণে একটি হাইব্রিড মডেল ব্যবহার করে। তবে আল-ক্বাইদার মডেল মাওইস্ট মডেলের অধিক নিকটবর্তী, বিশেষত জনসমর্থন কেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসরণের মাধ্যমে। আর জামাতুল বাগদাদীর মডেল ফোকোইস্ট মডেলের অধিক নিকটবর্তী।
মুসলিম বিশ্বে গেরিলা যুদ্ধে সর্বাধিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে আফগানিস্তান। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বের সেনাবাহিনীর তুমুল আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধ করে তালিবান টিকে আছে, এবং বিজয় অর্জন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এই বিজয়ের পেছনে আফগান জনগণের গভীর ও ব্যাপক সমর্থনের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর গৃহীত মডেলের মাধ্যমে তারা সাময়িক সাফল্য পেয়েছে এটা সত্য, কিন্তু সার্বিক ভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিজেদের সাথে এবং নিজেদের আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। খোদ ইরাকের গোত্রগুলোই সামরিক সক্ষমতা শেষ হবার সাথে সাথে জামাতুল বাগদাদীকে ত্যাগ করেছে, এটা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে। কারণ তাদের উপর জামাতুল বাগদাদীর নিয়ন্ত্রন সম্পূর্ণভাবে শক্তির মাধ্যমে অর্জিত। কিন্তু, এটি না পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ, আর নাই বা নাবুওয়্যাতের মানহাজ। ইরাক এবং সিরিয়াতে কৌশলগত ভাবে জামাতুল বাগদাদীর সবচেয়ে প্রশংসনীয় দুটি পদক্ষেপ হল তেলক্ষেত্র সমূহ দখলে নেয়া, এবং ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে যোগযোগের রুট নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয়া। প্রথমটির কারণে তারা অর্থের একটি স্থায়ী উৎস পেয়েছে। আর দ্বিতীয়টির কারণে তারা ইরাক থেকে সিরিয়াতে খুব দ্রুত সেনাদের আনা-নেয়া করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যখনই এদুটীর নিয়ন্ত্রন তারা হারিয়ে ফেলবে, তৎক্ষণাৎ তারা একটি ইমারাহর বদলে “হিট অ্যান্ড রান” পদ্ধতির একটি

আন্ডারগ্রাউন্ড তানজীমের পর্যায়ে ফিরে যাবে। যখন সেটা ঘটবে তখন ইরাকী গোত্রগুলো, এবং সিরিয়ার গোত্রগুলো তাদের সমর্থন দেবে না। বরং তারা তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। জামাতুল বাগদাদীর তখন আক্ষরিক অর্থেই ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো অবস্থা হবে।আর বর্তমানে এমনি হয়েছে । অন্যদিকে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তালিবান গেরিলারা যখন শহরগুলো থেকে পশ্চাৎপসরন করছে তখন, তারা জনগণের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সাধারণ মুসলিমদের মাঝে মিশে গেছে, জনগণ তাদের আশ্রয় দিয়েছে, সহয়তা দিয়েছে এবং রক্ষা করেছে। তারপর তারা পুনরায় সংগঠিত হয়ে, আক্রমণ করেছে- এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় অর্জন করেছে।
ইমারাহঃ
লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, আল-ক্বাইদার প্রতিটি শাখাই কোন না কোন সময় ইমারাহ ঘোষণার মতো তামক্বীন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। AQAP, জাবহাত আল নুসরার ব্যাপারে, আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এছাড়া AQIM এবং আল-শাবাব বিভিন্ন সময়ে ইমারাহ ঘোষণার পর্যায়ে পৌছেছিল। আল-শাবাবের পক্ষ থেকে ইমারাহ ঘোষণার ব্যাপারে তানজীম আল-ক্বাইদার অনুমতি ও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুমোদন দেয়া হয় নি। তানজীমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যে অঞ্চলের উপর তামক্বীন অর্জিত হয়েছে সেখানে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে ইমারাহ ঘোষণা না করার। এর কারণ হল, যখন আল-ক্বাইদার পক্ষ থেকে ইমারাহ ঘোষণা করা হবে, তখন সাধারণ মুসলিম জনগণ এ ইমারাহকে নিজেদের ইমারাহ মনে না করে, আল-ক্বাইদার ইমারাহ মনে করবে। ইয়েমেন, সোমালিয়া, মাগরিবের মতো গোত্রীয় সমাজে এর ফলে অসন্তোষ চাপাক্ষোভ কিংবা প্রকাশ্যক্ষোভ, সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। শামের ক্ষেত্রে যদি আল-নুসরা নিজেরাই ইমারাহ ঘোষণা করতো তাহলে অন্যান্য দলগুলো নুসরাকে নিজের প্রতিপক্ষে মনে করা শুরু করতো। এর ফলে বাশারের বিরুদ্ধে জিহাদ ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এছাড়া আরেকটি সমস্যা হল, আনুষ্ঠানিক ভাবে ইমারাহর ঘোষণা হলে, সেটা অ্যামেরিকার হামলা এবং আন্তর্জাতিকভাবে অ্যামেরিকার আগ্রাসনের পক্ষে একটি অজুহাত হিসেবে কাজ করতো। তৃতীয় কারণ, এবং অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ কারণ হল, প্রতিটি অঞ্চলে, প্রতিটি দল গেরিলা যুদ্ধের পর্যায়ে আছে। তারা কখনো তামক্বীন অর্জন করছে, আবার কৌশলগত কারণে পিছু হটছে। এ অবস্থায় যেহেতু ইমারাহর ঘোষণা দেয়া অনুচিত যেহেতু ঘোষণা না দিয়েও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। কারণ আগে আমরা যেমনটা বলেছি, ইমারাহ কিংবা খিলাফাহ শুধুমাত্র একটি ঘোষণা না বরং বাস্তবতাও। একই সাথে নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ের স্থিতিশীলতা অর্জনের পূর্বে ইমারাহর ঘোষণা দেয়া উচিৎ না। কারণ ঘোষণার কিছুদিন পর, সেই ইমারাহরা নাম-গন্ধ না

থাকা, এরকম ঘটনা মুজাহিদিন ও জিহাদ সম্পর্কে উম্মাহ সাধারণ মুসলিমদের ধারনাকে নষ্ট করে।
নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে (বিশ্বব্যাপী জিহাদি আন্দোলনের) পরিস্থিতি ছিল বেশ খারাপ। কারণ জিহাদি জামা’আ গুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম জনসাধারনকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মুজাহিদিন কি চাচ্ছেন, কেন জিহাদ করছেন, সাধারণ মুসলিমদের বুঝে এগুলো আসতো না। জিহাদী তানজীম এবং জামা’আ ছিল অনেক, কিন্তু তারা ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এবং সকলে বিভিন্ন জায়গায় তাওয়াগীতের মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা জিহাদি জামা’আগুলো একেক অঞ্চলে একেক তাওয়াগীতের বিরুদ্ধে ক্বিতালে লিপ্ত ছিল। কখনো তারা জিতছিল, কখনো তারা হারছিল। আর এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাওয়াগীত মুজাহিদিনকে কোন না কোন ভাবে অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছিল…যখন আমরা এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করি, আমরা দেখি কিভাবে তাওয়াগীত কিভাবে পেশির জোরে, অস্ত্রের জোরে উম্মাহর উপর কতৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং নিজেরদের টিকিয়ে রেখেছে। কিভাবে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রন করার মাধ্যমে, তারা সাধারণ মুসলিম জনগণের চিন্তা ও বিবেকের নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করেছিল। মোটকথা, সব জায়গাতেই জিহাদি আন্দোলন ব্যাপক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছিলো, এবং অবরুদ্ধ হয়ে পরছিল। আফগানিস্তান ছাড়া আর কোথাও তারা কোন নিরাপদ আশ্রয় পেলেন না। অন্যান্য সব জায়গাতেই তাদের খোজা হচ্ছিলো, হত্যা করা হচ্ছিল। আফগানিস্তানে নিরাপদ আশ্রয় পাবার পর, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জিহাদি জামা’আর মুজাহিদিন উমারাহগণ এ অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা, পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ করলেন – কিভাবে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হল, আর কিভাবেই বা সমস্যার সমাধান করা যাবে? কাবুল ও কান্দাহারে বেশ কিছু মিটিং হল। শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ দেখলেন, জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির) । সে শত্রুকে না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক । তাই কোন মুরতাদ তাগুতের অপরাধের পরিমান অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু যায়নিস্ট-ইহুদী ও খ্রিষ্টান-ক্রুসেডারদের কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য। একারণে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে উম্মাহর মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।– শাইখ আবু বাসির নাসির আল উহায়শী রাহিমাহুল্লাহ ।
কৌশলগত পর্যালোচনার এই পর্বে, আমরা আলোচনা করবো বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে জিহাদ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মূল আলোচনায় যাবার আগে একটি বিষয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করেছি তা তানজীম আল-ক্বাইদার বিভিন্ন অফিশিয়াল

প্রকাশনা ও উমারাহ ও উলেমাগণের বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যের আলোকে। তাই এগুলো তানজীম আল-ক্বাইদার সাধারণ দিক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত এ কথা বলা যায়। আমরা নিজে থেকে কোন কিছু শাইখদের উপর, কিংবা তানজীম আল-ক্বাইদার উপর আরোপ করি নি। কিন্তু এ পর্বে যে আলোচনা হবে, মানহাজের একজন ছাত্র হিসেবে আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণমাত্র – কোন তানজীম বা জামা’আর অফিশিয়াল বক্তব্য না। একারণে এ পর্বের কথাগুলোকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হিসেবেই ভাইরা গ্রহণ করবেন এবং এক কোন তানজীমের উপর আরোপ করবেন না। একথাটি এখানে বলা প্রয়োজন, কারণ আল্লাহ্* সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ইচ্ছায় এ ভূমিতে তানজীম আল-ক্বাইদার কাজ শুরু হয়েছে। AQIS এর মুজাহিদিন এখানে কাজ করছনে, আল্লাহ্* তাদের হেফাযত করুন এবং সাফল্য দান করুন– নিশ্চয় সাফল্য একমাত্র আল্লাহ-র পক্ষ থেকে। যেহেতু এ মুহূর্তে তানজীম আল-ক্বাইদার কাজ চলছে, আর যেহেতু আমি উসামার মানহাজের আলোকে এই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি, তাই ভুলবশত কেউ মনে করতে পারেন যে এটাই হয়তো তানজীমের বক্তব্য। কিন্তু তানজীমের অফিশিয়াল বক্তব্য ছাড়া আর কোন বক্তব্যকে তানজীমের বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ না করার ব্যাপারে আমদের সতর্ক হতে হবে। আর আমাদের ভাইদের অফিশিয়াল বক্তব্যআল্লাহর ইচ্ছায়, তানজীম আল ক্বাইদার মিডিয়া ফ্রন্ট GIMF (Global Islamic Media Front) থেকে GBT [GIMF Bangla Team] –এর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং, অন্যান্য আর কোন বক্তব্য, বিশ্লেষণ, বিবৃতিকে অফিশিয়াল বিশ্লেষণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এখানে যা লেখা হচ্ছে, তা উসামার মানহাজের একজন নগন্য ছাত্র হিসেবে আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ, যা তানজীমের অবস্থানের সাথে মিলতে পারে, নাও মিলতে পারে। এবং আমার বক্তব্যের চাইতে তাদের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ গুণ বেশি।
এবার মূল আলোচনায় যাওয়া যাক।
শাইখ আবু বাসির রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব ব্যাপক। প্রথমত, শাইখ আবু বাসির রাহিমাহুল্লাহর অবস্থানের কারণে। শাইখ ছিলেন AQAP এর আমীর, এবং তানজীম আল-ক্বাইদার নায়েবে আমীর, বৈশ্বিক কর্মকান্ডের [external operations] ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল। এছাড়া আফগানিস্তানে শাইখ আবু বাসির দীর্ঘদিন শাইখ উসামার ব্যক্তিগত সহকারির (secretary)দায়িত্ব পালন করেছেন। যে কারণে মুজাহিদিন উমারাহদের মিটিং এর ব্যাপারে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকাটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, শাইখের এই উদ্ধৃতি থেকে শাইখ উসামা এবং তানজীম আল-ক্বাইদার মানহাজের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় – জিহাদি

আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির) । সে শত্রুকে না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক। আমাদের আজকের পর্যালোচনার জন্য এই নীতিটি সঠিক ভাবে অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন
কৌশলগত পর্যালোচনাঃ বাংলাদেশঃ
ইতিহাসঃবাংলাদেশে জিহাদি আন্দোলনের ধারার সূচনা আফগান ফেরত মুজাহিদিনের মাধ্যমে। আপনাদের হয়তো মনে আছে, শাইখ উসামা অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে সর্বব্যাপি যুদ্ধের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেখানে সাক্ষরকারীদের একজন ছিলেন হারকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের (হুজি-বি) আমীর শাইখ ফাজলুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ। হুজি-বি প্রতিষ্ঠিত হয় ৯২ এ হারকাতুল জিহাদ আল ইসলামি-র প্রতিষ্ঠার পর। বাংলাদেশের ব্যাপারে নব্বইয়ের দশকে এবং ২০০০ এর শুরুর দিকে তানজীম আল-ক্বাইদার পরিকল্পনা ছিল আরাকানে জিহাদের জন্য বাংলাদেশকে একটি বাফার যোণ (Buffer zone-স্টোর)হিসেবে ব্যবহার করা। যেমন আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান এবং শামের জন্য টার্কি ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে আরাকানের জন্য চট্টগ্রাম কৌশলগতভাবে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। আরাকানে লোক এবং অস্ত্র পাঠানোর জন্য এটিই সর্বোত্তম রুট। পাশপাশি আরাকানে জিহাদের প্রশিক্ষনের জন্য, এই অঞ্চলটির গুরুত্ব খুব বেশি। এছাড়া লস্কর-ই-তাইয়্যেবার কিছু সদস্য বাংলাদেশের অবস্থান করেছেন, ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া আসা এবং আনা-নেয়ার জন্য বাফার যোন হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহারের জন্য।
হারাকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের মধ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিভক্তি দেখা দেয়। নব্বইয়ের দশকে হুজি-বির একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশান ছিল ৯৯-এ মুরতাদ শামসুর রাহমানকে হত্যা প্রচেষ্টা। বিভক্তির একটি কারণ ছিল, বাংলাদেশে কি ধরণের হামলা করা হবে বা আদৌ করা হবে কি না এই নিয়ে মতভেদ। এছাড়া বিভক্তির আরো কিছু কারণ ছিল যেগুলো আলোচনা করাটাও কষ্টকর। এই সময়ে ১৯৯৮ শাইখ আবদুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ
– জেএমবি – গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। জেএমবির উত্তরাঞ্চলে কর্মকান্ড শুরু করে। তারা মূলত মুরতাদ-নাস্তিক সর্বহারা, বিদেশি এনজিও, খ্রিষ্টান মিশনারী এবং মাজারপূজারি-পীরদের বিরুদ্ধে কর্মকান্ড শুরু করে। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা জেএমবির উত্থান ২০০৫এ সিরিয বোমা হামলার মাধ্যমে। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। সিরিয বোমা হামলার আগেই জেএমবি তাদের মূল ঘাঁটি উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে বাগমারা এবং কাছাকাছি অঞ্চলে, ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক পর্যায়ে এখানে পরিস্থিতি এমন ছিল যে, বাংলা ভাই রাহিমাহুল্লাহ, জনসম্মুখে এক মুরতাদ-নাস্তিকদে জবাই করেন, এবং জনগণ একে সমর্থন করে। শাইখ আবদুর

রাহমান নিয়মিত একসময় আদালত পরিচালনা করতেন এবং লোকজনের মধ্যে দন্ধ-বিবাদ, শরিয়া অনুযায়ী মিটমাট করে দিতেন। এমনকি এক পর্যায়ে ডিসির অফিসে বসেও জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান আতাউর রহমান সানি রাহিমাহুল্লাহ মিটিং করেছিলেন অন্যান্য সদস্যদের সাথে। মূলত ২০০০ সাল থেকে এ দুটি তানজীম বাংলাদেশে কার্যকলাপের প্রসার শুরু করে। ২০০০ সালে হুজি-বি হাসিনাকে কোটালিপুরে হত্যার একটি চেষ্টা চালায় (৭৬ কেজি বোমা মাটিতে পুতে রাখা হয়েছিল)। ২০০১ সালে রমনা বটমূলে হুজি-বি বোমা হামলা চালায়। পরবর্তীতে হুজি বি আরও কয়েকবার হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা চালায়, যার মধ্যে ২০০২ সালে সাতক্ষীরার কালাওরার ঘটনা (বন্দুকের মাধ্যমে হত্যাচেস্টা) এবং ২১ অগাস্ট, ২০০৪ এর গ্রেনেড হামলা প্রসিদ্ধ। এ হামলার গুলো পরিচালিত হয়েছিল মূলত শাইখ মুফতি আবদুল হান্নান রহিঃ এর নিয়ন্ত্রিত অংশের দ্বারা। ২০০৫ সালে তিনি গ্রেফতার হন। ২০০৫ সালে হুজি-বিকে নিষিদ্ধ করা হয়। তারপর থেকে হুজি-বির আর কোন কর্মকান্ডের কথা জান যায় না।
জেএমবি ২০০১ থেকে উত্তরাঞ্চলে নিয়মিত হামলা চালালেও মূলত স্পটলাইটে আসে ২০০৫ সালের, ১৭ অগাস্টের সিরিয বোমা হামলার মাধ্যমে। একটি সমন্বিত পরিকল্পনার দ্বারা পুরো দেশের ৬৩টি জেলায় ৫০০টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এ বোমা হামলার উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পর্যায়ে জেএমবির কর্মকান্ড শুরু ঘোষণা দেয়া। এবং এদিন পুরো দেশে জেএমবির আহবান সম্বলিত লিফলেট ছড়িয়ে দেয়া হয়। জেএমবি সরকার, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং জনগণকে ইসলামী শরিয়া তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। এছাড়া জেএমবি ২০০৫ এ আরো কিছু হাই প্রোফাইল আক্রমণ চালায়। অনেকেই জেএমবির একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় হামলার ব্যাপারে জানেন না আর তা হল মুরতাদ হূময়ান আজাদের উপর ২০০৪ সালে আক্রমণ।
২০০৬ সালে শাইখ আবদুর রাহমান, আতাউর রহমান সানি এবং বাংলা ভাই সহ ছয়জন শূরা সদস্যকে রেব গ্রেফতার করে, ২০০৭ সালে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় – রাহিমাহুল্লাহু ‘আলা আজমাইন। পরবর্তীতে জেএমবি কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের সক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ২০০৬ সালে মাওলানা সাইদুর রহমান আমীর নিযুক্ত হন। তিনি ধরা পরেন ২০১০ এ। ২০০৫ থেকে ২০১০ এর মধ্যে তাদের উচ্চ পর্যায়ের সদস্যদের বেশিরভাগই ধরা পরে যান। মূল শূরা সদস্যরা এবং আমির বন্দী থাকায় সংগঠনের মধ্যে একটি বিভক্তি দেখা দেয়। বন্দী ব্যক্তি কিভাবে আমীর থাকেন? – এর ভিত্তিতে সংগঠন দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় – যা ভেতরের গ্রুপ, বাইরেরগ্রুপ নামে প্রসিদ্ধ। থেমে থেমে তারপরও তারা কিছু কিছু কাজ চালিয়ে যায়, কিন্তু আগের সে ক্ষমতার কাছাকাছি আর আসতে

সক্ষম জেএমবি হয় নি। জেএমবি সাম্পরতিক সময়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ আক্রমণ চালায় ২০১৪ সালের ত্রিশালে, যখন তারা প্রিসন ভ্যান থেকে সংগঠনের তিনজন শূরা সদস্যকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়। জামাতুল বাগদাদির খিলাফাহ ঘোষণার পর জেএমবির একটি অংশ তাঁদেরকে বাই’য়াহ দেয় এবং তারাই মূলত বিদেশি, এনজিও, মিশনারী, হোসেনী দালান, এবং আহমেদিয়্যাদের উপর হামলা পরিচালনা করে। তবে জেএমবির পুরো তানজীম সম্ভবত এখনো বাগদাদীকে বাই’য়াহ দেয় নি। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাশপাশি, সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গেও তাদের উপস্থিতি আছে, যা ২০১৪ সালের বর্ধমান বিস্ফোরনের ফলশ্রুতিতে জানা যায়।
হুজি - বি ও জেএমবির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাঃ
সংক্ষেপে এই হল, বাংলাদেশের দুটি জিহাদি তানজীমের পরিচয় এবং কর্মকান্ডের বিবরণ। এদের মধ্য হারকাতুল জিহাদ হল কওমি তথা দেওনবন্দি ধাঁচের এবং জেএমবি হল আহলে হাদিস বা সালাফি। হারকাতুল জিহাদের একটি অংশ এক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় যোগ দেয়, যা তাদের ইরজার পরিচায়ক। অন্যদিকে জেএমবির একটি অংশের মধ্যে তাকফিরের ব্যাপারে গুলুহ (চরমপন্থা) বিদ্যমান। বিশেষ করে যে অংশটি বাইরের অংশ বলে পরিচিত, তাদের মধ্যে। আর এর কারণ হল এই অংশের মধ্যে উলামার অনুপস্থিতি।
অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও এই দুই তানজীমের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বিদ্যমান – আর তা হল কৌশলগত।
দুটি তানজীমই ঐ ভুলটি করেছে যা শাইখ আবু বাসিরের উদ্ধৃতিতে উঠে এসেছে, “ কারণ জিহাদি জামা ’ আ গুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম জনসাধারনকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল । “ হুজি-বি এবং জেএমবির ব্যাপারে এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য। একারণেই রমনা বটমূলে হুজি-বির হামলা এবং আদালতে জেএমবির হামলা সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রায় কোন সমর্থনই পায় নি বললেই চলে।
একই সাথে দুটি তানজিম একই ভুল করেছে যাকে সামরিক পরিভাষায় বলা হয় “Strategic Overreach” বা “স্বীয় সক্ষমতার বাইরে প্রসার”। এর অর্থ হল, সক্ষমতা তৈরি করার আগেই নিজের কর্মকান্ডের পরিধি এমনভাবে বাড়ানো যা শেষ পর্যন্ত নিজের পতন ডেকে আনে। বিশেষ করে জেএমবির ব্যাপারে এটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় পর্যায়ে আত্বপ্রকাশের আগে জেএমবি তাদের আঞ্চলিক কাজে ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছিলো, এবং পরিস্থতিও মোটামুটি অনুকূলে ছিল। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তারা এমন এক সময়ে আত্বপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে তাদের কাজের যে প্রতিক্রিয়া হবে তার মোকাবেলা করার সক্ষমতা তাদের তৈরি হয় নি। যে কারণে সরকার বেশ দ্রুত তাদের শীর্ষ নেতাদের আটক করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে

সক্ষম হয়। হুজি-বি ২১ শে অগাস্টের হামলার উপর অনেক বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলে। কারণ হামলা সফল হলে বিএনপি সরকার হয়তো বা তাদেরকে রক্ষা করলেও করতে পারতো, কিন্তু একথাটি তারা বুঝতে ব্যর্থ হন যে, হামলা ব্যর্থ হলে যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিক্রিয়া হবে তার মোকাবেলা করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনটাই বিএনপি সরকারের ছিল না।
প্রতিটি গেরিলা আন্দোলনের জন্য strategic overreach বা “স্বীয় সক্ষমতার বাইরে প্রসার”কবীরা গুনাহর মতো। এটি এমন এক ভুল যা কোন ভাবেই করা যাবে না। ইতিহাসখ্যাত সমরবিদ সান-যু, প্রায় ২৫০০ বছর আগে লেখা তার ইতিহাসবিখ্যাত সামরিক কৌশলের গ্রন্থ ‘The art of war” (“যুদ্ধনামী শিল্পের মূলনীতিসমূহ”) লিখেছেন – বুদ্ধিমান সেনাপতি সবসময় যুদ্ধের সময় ও স্থান নিজে নির্ধারণ করেন । প্রতিপক্ষ যখন চান তখন তিনি যুদ্ধে জড়ান না। বরং তিনি যখন চান তখন তিনি প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে টেনে আনেন।
শাইখ উসামার ৯/১১ এর হামলার পেছনে এই নীতির বাস্তবায়ন দেখা যায়। যদিও অ্যামেরিকা চাচ্ছিলো না, সরাসরি একটি স্থলযুদ্ধে আফগানিস্তানে জড়িয়ে যেতে, কিন্তু শাইখ উসামা অ্যামেরিকাকে বাধ্য করেন। এবং ভৌগোলিক, সামাজিক, সামরিক, এবং আদর্শিক ভাবে অ্যামেরিকার সাথে একটি দীর্ঘ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহ-র ইচ্ছায় বিজয়ের জন্য, আফগানিস্তান ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। অন্যদিকে বাংলাদেশে হুজি-বি এবং জেএমবির আক্রমণের দিকে তাকালে দেখা যায়ঃ
১। জনগনের মধ্যে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা। জেএমবির ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বা দাওয়াহর জন্য তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন (সিরিয বোমা হামলা) তাই মিডিয়ার কারণে তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে যায়। রাতারাতি সমস্ত দেশকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা সহজ হয়। গেরিলা যুদ্ধের যে আলোচনা আমরা এর আগে করেছিলাম, তার আলোকে বলা যায়, তাদের অবস্থা হয়েছিল পানি ছাড়া, ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত।
২। নিজেদের জনসমর্থনের একটি শক্ত বেস না থাকা। পুরো দেশের অধিকাংশ জনগণ শুরু থেকেই জিহাদ সমর্থন করবে এটা দুরাশা, এবং এরকম হবে না। কিন্তু ইসলামপন্থী জনগণের [অর্থাৎ যারা মোটা দাগে শরিয়াহ চায় এবং দ্বীনকে ভালোবাসে সেক্যুলার রাষ্ট্রকে অপছন্দ/ঘৃনা করে] সমর্থন ও এ সময়ে ছিল না। যদি এই সমর্থনের কথা বাদও দেই, এই ইসলামপন্থী জনগণ জানতোই না যে আসলে কি হচ্ছে। যেকারনে জামা’আগুলোকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত সহজ হয়েছে। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যতো কঠিন হবে, গেরিলাকে হারানোও ততোই কঠিন হবে।

৩। নিজেদের চোখে পড়ার মত কোন মিডিয়া না থাকা। নিজেদের কোন মুখপাত্র তাদের ছিল না। মিডিয়া একচেটিয়া ভাবে প্রপাগান্ডা চালিয়ে গেছে। তবে এটা সত্য বর্তমানে ইন্টারনেটের যে প্রচলন আছে, যার কারণে অনলাইন মিডিয়ার প্রসার আছে, তেমনটা তখন ছিল না। কিন্তু তবুও নিজেদের একটি মিডিয়া থাকার দরকার ছিল, বিশেষত জেএমবির যেহেতু তারা জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।
৪। রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার প্রস্তুতি না নিয়েই সরাসরি মোকাবেলার পর্যায়ে ঢুকে যাওয়া –strategic overreach। ইতিপূর্বে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নিজেদের শীর্ষ নেতাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া প্রস্তুতির অভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যুদ্ধে নেতারা ধরা পড়বেন বা নিহত হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক সাথে শীর্ষ পর্যায়ের বেশির ভাগ নেতা ধরা পরে যাবেন এটা স্বাভাবিক না। আর সম্মুখ যুদ্ধ বা OPEN FRONT এ আপনি তখনই যাবেন যখন আপনি জানেন আপনার বেশ কিছু নেতা ধরা পড়লেও আপনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়া যথাযথ অস্ত্রের মজুদ না রাখা আরেকটি কৌশলগত দুর্বলতা। আর জিহাদি সংগঠন গুলোর জন্য, বিস্ফোরকের সকল উপকরনের প্রয়োজনীয় মজুদ রাখা, উচু মানের বিস্ফোরক আনা নেয়ার রুট তৈরি এবং নিরাপধ রাখা। পাশপাশাশি একাধিক বোমা বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। যদি সংগঠনে শুধু একজন বোমা বিশেষজ্ঞ থাকে তবে তার এই শিক্ষা কয়েকজন উপযুক্ত ছাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, এবং একবার ছাত্রদের প্রশিক্ষন শেষ হলে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এক জায়গায় রাখা যাবে না। যাতে সবাই এক সাথে ধরা না পরে। অন্যথায়, পুরো জামা’আর বিস্ফোরক ব্যবহারের সক্ষমতা কমে যাবে। বোমা বিশেষজ্ঞ না থাকার ফলাফল কি হতে পারে, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল হোসেনি দালানের হামলা এবং আহমেদিয়া মসজিদে জামাতুল বাগদাদির ইসতিশাদি হামলা। দ্বিতীয় হামলায় হামলাকারির পাশে দাড়ানো দুই ব্যক্তিও মারা যায়নি, অথচ হামলাকারি মারা গেছে। হোসেনি দালানে অত্যন্ত ভিড়ের মধ্যে বোমা ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে নি, কারণ অত্যন্ত নিচু মানের বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বোমা প্রস্তুতকারক সম্ভত তার কাজে পারদর্শি না।
৫। সিকিউরিটি বা সাংগঠনিক কাজের গোপনীয়তার নিরাপত্তাগত দুর্বলতা। আমরা এই দুই তানজিমের ক্ষেত্রে এখনো দেখতে পাই, কোন একটি কাজ করার পর পর, এবং অনেক ক্ষেত্রেই কাজের আগেই [অর্থাৎ কাজের প্রস্তুতির সময়] তারা ধরা পরে যাচ্ছেন। এই দুই তানজীমের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির কি করুণ অবস্থা তা বোঝার জন্য এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এ দুটি তানজীমের নেটওয়ার্ক এতো গভীরভাবে

আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে কোন একটি কাজের পর, কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের তো বটেই, অন্যান্য আরো কিছু সদস্যকেও তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে।
পর্যালোচনাঃ
মু’মিন কখনো এক গর্ত থেকে দু’বার দংশিত হয় না। আর জ্ঞানী তারাই যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।হুজি-বি এবং জেএমবির ইতিহাস থেকে বেশ কিছু মূল বিষয় উঠে আসে যা আমাদের সকলের গভীর ভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ।
১। যদি আমরা আসলেই বাংলাদেশে এমন একটি জিহাদ শুরু করতে চাই যা বাংলাদেশের মানচিত্র পাল্টে দেবে এবং বাস্তবতা আগাগোড়া বদলে দেবে তাহলে আমাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে আগাতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, আসবাব ও রসদ মজুদ করতে হবে। হুটহাট কিছু করা যাবে না। একটি দুটি প্রলয়ঙ্করী হামলা দিয়ে বিশ্বের মনোযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ শরিয়াহ কায়েম, তাগুতের পতন এবং সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রন অর্জিত হবে না।
২। দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গেলে, জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের মধ্যে মুজাহিদিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। শাইখুল মুজাহিদ আব্দুল্লাহ আযযাম যাকে বলেছেন ‘দাওয়াহ’। আর মাও সে তুং যাকে বলেছে জনগণের জাগরণের পর্যায়। জনগণকে ছাড়া গেরিলা যোদ্ধা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রুর বিমান, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ আছে। ক্রুসেডার আর হিন্দুত্ববাদি ভারতের সমর্থন তার আছে, আছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, আর আছে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। জনগণের সমর্থন ছাড়া আপনি যদি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে টীকে থাকা অত্যন্ত কঠিন।
৩। বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও গাথুনিকে বুঝতে হবে।শাইখ আবু মুসাব আস-সুরি তার The Global Islamic Resistance Call–এ কোন ভূমির Open front জিহাদের জন্য উপযুক্ততা পরিমাপের জন্য কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন। যার মধ্যে একটি হল ভৌগোলিক অবস্থা। যেহেতু মুজাহিদিন এবং তার শত্রুদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নেই তাই তাদের যুদ্ধ হবে একটি অভারসাম্যপূর্ণ যুদ্ধ বা Asymmetric Warfare. এধরণের যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে শক্তিশালী শত্রুকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টেনে এনে, শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে তার পরাজয় ঘটানো। যেমন অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনে পরাজিত করা হয়েছে।
ব্যাপারটা আপনার এভাবে চিন্তা করতে পারেন – ধরুন আপনার কাছে একটি ব্লেড আছে মাত্র, আর আপনার একটি হাতিকে মারতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি সরাসরি হাতির উপর ব্লেড নিয়ে চড়াও হলে আপনার

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি, হাতি তার ওজন আর শক্তি ব্যবহার করে আপনাকে পিশে ফেলবে। কিন্তু আপনি যদি কৌশলে হাতিকে একটি চোরাবালিতে টেনে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে হাতির ওজনই তার জন্য কাল হয়ে দাড়াবে। সে চোরাবালিতে আটকে যাবে।। যতো নড়বে তটো আরও গভীরে তলিয়ে যাবে। এ অবস্থায় আপনি আস্তে আস্তে ব্লেড দিয়ে হাতির গায়ে বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যের সাথে ৫ হাজার ক্ষত সৃষ্টি করুণ। প্রতিটি নতুন ক্ষতের সাথে সাথে রক্তক্ষরণে হাতি দুর্বল হতে থাকবে। আর প্রতিবার নড়াচাড়ার ফলে তার রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি পাবে। এক পর্যায়ে হাতি রক্তক্ষরণের কারণে মারা যাবে। অ্যামেরিকা হল এই গল্পের হাতি, আফগানিস্তান হল চোরাবালি আর ৯/১১ এর হামলা হল সেই কৌশল যা অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনেছে। আর মুজাহিদিনের অল্পস্বল্প অস্ত্র এবং বিস্ফোরক হল ব্লেড যা নিয়ে তারা অ্যামেরিকার ব্যাপক সমর শক্তির মুখোমুখি হয়েছে। আর এ ধরণের যুদ্ধই হল Asymmetric warfare যা হল গেরিলা যুদ্ধ। পুরো ব্যাপারটাতে চোরাবালির গুরুত্ব দেখুন। চোড়াবালি ছাড়া কিন্তু পুরো পরিকল্পনাই বাতিল।শাইখ আবু মুসাব আস-সুরির তার কিতাবে ব্যাপক বিশ্লেষণের পর দেখিয়েছেন দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ভূমি হল যেখানে পর্বত ও জঙ্গল আছে। কারণ পাহাড় ও জঙ্গল গেরিলাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উত্তম, কারণ এগুলো বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া মরুভূমির উপস্থিতি এবং দুর্গম ভূখণ্ড গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ ভৌগোলিক ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সমতল। যে কারনে যে নীতি আফগানিস্তানের ভৌগলিক বাস্তবার জন্য প্রযোজ্য, তা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য না। সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইসলামি মাগরিব, লিবিয়া, কাশ্মীর, ওয়াযিরিস্তান, কাভকায, সবগুলো জায়গাতেই পাহাড় বা জঙ্গল কিংবা মরুভূমি আছে, এবং এসব জায়গা বেশ দুর্গম যে কারনে এসব ভূখণ্ডে মুজাহিদিন গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতিতে সফল হয়েছেন।
তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি করা যেতে পারে? এজন্য আমরা অন্য দুটি ভূখণ্ডের দিকে তাকাতে পারি যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ সফল হয়েছে। আর এ দুটি ভূখন্ড হল ইরাক এবং শাম। হ্যা, একথা সত্য যে শাম বা ইরাক কোনটাই বাংলাদেশের মতো সমতল না। শামে পাহাড় এবং মরুভূমি দুটোই আছে, আর ইরাকেও মরুভূমি আছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিশয় হল শাম এবং ইরাকে জিহাদ এসব দুর্গম অঞ্চলে শুরু হয় নি। বরং এ দুক্ষেত্রেই শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে শামে। আর এখানেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনের প্রশ্ন আসে। ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল অ্যামেরিকার আগ্রাসনের মাধ্যমে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের উপর অ্যামেরিকা সমর্থিত শি’আ শাসন

চাপিয়ে দেয়ার কারনে। একই সাথে ইরাকি সমাজ গোত্র নির্ভর, যেকারনে গোত্রীয় নিয়মকানুনের প্রভাব ইরাকি সমাজে ছিল, একই সাথে গোত্রগুলোর কাছে কিছু অস্ত্র মজুদ ছিল, যেগুলো সবসময় তাদের কাছে থাকে।
অন্যদিকে শামে বিপ্লব এবং জিহাদ শুরু হয় শহরগুলোতে। দামাস্কাস, দারা, আলেপ্পো, ইদলিব, হিমস, হামা এসব শহর ছিল বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। এখনো যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো, জাইশ আল ফাতেহর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হল ইদলিব, আলেপ্পোর কিছু অংশ, ইত্যাদি। শহর গুলোম শহরের মানুষগুলো এই ভয়াবহ প্রায় ৭ বছরের যুদ্ধের পরও, প্রচন্ড অনাহার, ব্যাপক মৃতু এবং অবর্ণনীয় কস্টের পরও জিহাদ আঁকড়ে আছেন। এর কারন কি? কারন হল সামাজিক বাস্তবতা। শামে সংখ্যালঘু নুসাইরি সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের শাসন করতো। যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয় তখন সরকার ব্যাপকভাবে সুন্নিদের হত্যা-ধর্ষন-নির্যাতন শুরু করে। যে কারনে সুন্নিরা বাধ্য হয় অস্ত্র তুলে নিতে।
লক্ষ্যনীয় বিষয় হল বাংলাদেশে ইরাকের মতো শি’আ সুন্নি বিভেদ নেই। এখানে শি’আরা ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু এবং তারা ক্ষমতায় নেই। তাই ইরাকে যে শি’আ বিরোধী জন্মত ছিল যা শাইখ আবু মুসআব আল যারকাউয়ী ব্যবহার করেছিলেন সুন্নি সমর্থন পাবার জন্য, সেটা বাংলাদেশে অনুপস্থিত। একারনেই হোসেনি দালানের হামলা, কিংবা শি’আদের হোসেনিয়াতে হামলার কোন কৌশলগত মূল্য নেই। বাংলাদেশের চাইতে পাকিস্তানে শি’আদের প্রকোপ অনেক বেশি। সেখানে শি’আ সুন্নি দ্বন্দ্বো বিদ্যমান। দীর্ঘদিন ভুট্টোদের শি’আরা পাকিস্তানের ক্ষমতায়ও ছিল। শিআ’দের প্রভাব কমানো এবুং নিয়ন্ত্রনের জন্য পাকিস্তানে সিপাহ ই সাহাবা এবং লস্কর ই জাঙ্গভীর মতো বিভিন্ন দলেরও অস্তিস্ত্ব ছিল/আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শি’আ বিরোধি কৌশল দিয়ে এ দলগুলো বেশি এগোতে সক্ষম হয় নি। সুতরাং পাকিস্তানের মতো জায়গায়, যেখানে শি’আ সুন্নি বিভেদ বিদ্যমান সেখানে যদি শুধুমাত্র শি’আ বিরোধিতার কৌশল জিহাদের জন্য কার্যকর না হয়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে শি’আ সুন্নি বিভেদ নেই সেখানে এটা কতটুকু কার্যকর হতে পারে?
আপনি তখনোই সমাজে দাঙ্গা কিংবা সহংসতা সৃষ্টির জন্য কোন বিভেদকে কাজে লাগাতে পারবেন যখন সেটার অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু যদি এই বিভেদের অস্তিত্বই না থাকে, তাহলে কিভাবে এই অস্তিত্বহীন বিভেদকে কাজে লাগিয়ে জনগনকে জিহাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে? ওয়াল্লাহি যারা মনে করে বাংলাদেশে শিয়া বিরোধি, কিংবা আহমেদিয়্যা বিরোধি হামলা দিয়ে জনগনকে জিহাদের সাথে

সম্পৃক্ত করা যাবে, তারা নির্বোধ। একইভাবে রমনা বটমূল, নিউ ইয়ার কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডে-র কোন অনুষ্ঠানে চাঞ্চল্যকর হামলা করা তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু কৌশলগত ভাবে এগুলোর তেমন কোন তাৎপর্য নেই। কারণ সাধারন জনগনকে এধরনের হামলা গুলো দূরে সরিয়ে দেবে। একারনে পরিস্থতি সৃষ্টির আগে এমন কোন হামলা করা যাবে না, যা মুজাহিদিনকে এবং জিহাদকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে সবচেয়ে বেশি যা মেলে তা হল শামের পরিস্থিতি। যদিও শামের মতো নুসাইরিরা বাংলাদেশে নেই। কিন্তু বাংলাদেশে একটি ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় সরকার আছে যারা সরাসরি ভারত দ্বারা সমর্থিত, এবং যে সরকারের অধীনে সচিবালয়ে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যাপকভাবে মুশরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর বর্তমানে বিচারবিভাগের অনেক দায়িত্তশীল মুশরিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রশাসনে মুশিরকদের এই ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারনা ও অসন্তোষ রয়েছে। একই সাথে সরকারের পরিস্কার ইসলাম বিরোধী একটি ইমেজ আছে, যা জনগণের কাছে পরিস্কার। হাসিনার সরকার যে ইসলাম বিরোধি জনমনে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিভাবে ইসলামের দিকে আসতে হবে, ইসলাম আনতে হবে এ নিয়ে মানুষ এখনো ওয়াকিফহাল না। একই সাথে আছে কওমি ভাইদের উপর হাসিনার ক্রমাগত অত্যাচারের এক ধারা, যা শুরু হয়েছিল ৫ মে । তবে এটাও কিছু শিথিল হয়ে গেছে । পাশপাশি বাড্ডাতে মন্দিরে পবিত্র কুর’আন পোড়ানোর মতো ঘটনা এবং সেই মালউনকে পুলিশের নিরাপত্তা দেয়া এই সরকারের ইসলামবিরোধী চরিত্রকে আরো পরিষ্কার করে তোলে। এ ধরণের ঘটনাকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে তাকে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।বরিশালে শাতেমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের গুলি ।
মোট কথা বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের একমাত্র উপযোগি মডেল হল শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধ যেমনটা আমরা শামে দেখছি। আর এরকম একটি দির্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে সফলভাবে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন জনসমর্থন এবং জনসম্পৃক্ততা। আর জনসমর্থন তথা জনসম্পৃক্ততা তৈরির হন্য শি’আ বা আহমেদিয়্যা কিংবা মিশনারি এবং এনজিওদের টারগেট করা বাংলাদেশের জন্য কার্যকরী হবে না – যদিও এ প্রতিটী কাফির গোষ্ঠীই ইসলামের শত্রু। একটি প্রবল অজনপ্রিয় শাসক যদি সরাসরি মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় , এবং যেকোন মূল্যে ক্ষমতা আকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় – সেক্ষেত্রে যদি শাসক এবং শাসকের সমর্থক গোষ্ঠীকে যদি মৌলিক ভাবে আলাদা করে ফেলা যায় [অর্থাৎ আওয়ামী লিগ বনাম মুসলিম , আওয়ামী লিগ - সেক্যুলার বনাম মুসলিম , আওয়ামী - হিন্দু - সেক্যুলার বনাম মুসলিম] তবে সেক্ষেত্রে শহর ভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ এমন ভুখন্ডেও সফল হতে পারে যা ভৌগলিক ভাবে গেরিলা যুদ্ধের জন্য

অতোটা উপযুক্ত হয়তো না । তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ যুদ্ধটা কাফির/তাগুত/ভারত/আওয়ামী লীগ বনাম ইসলাম এভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। হাসিনা-ভারত সেক্যুলার বনাম জিহাদি বা আল-ক্বাইদা বা সালাফি বা দেওবন্দি এভাবে চিত্রায়িত করলে হবে না। এর উত্তম প্রমাণ হল শাহবাগ বনাম যখন জামাত ছিল অর্থাৎ মিডিয়া যখন এভাবে চিত্রায়িত করছিল, তখন শাহবাগ জিতছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা শাহবাগ বনাম ইসলামে রূপ নিল, মানুষের মনে এই ধারণা তৈরি হল, তখন মিডিয়ার হাজার প্রপাগান্ডা কোন কাজে আসলো না। অথচ এর আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ যখন ব্যাপারটা একটা দলকেন্দ্রিক অর্থাৎ জামাত বনাম শাহবাগ ছিল ততোক্ষণ কিন্তু তাঁরাই জিতছিল। তাই জিহাদিদের কাজ হবে জিহাদের পরিস্থতি শুরু আগ পর্যন্ত সংঘাতটাকে – আওয়ামী- নাস্তিক-সেক্যুলার-ভারত-ক্রুসেডার জোট বনাম ইসলাম – এভাবে চিত্রায়িত করা। কিন্তু আল্লাহ-র ইচ্ছায় একবার জিহাদ শুরু হয়ে গেলে নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া। আর এটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে। কারন শাইখ উসামার ভাষায় –
জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য (যাহির)। সে শত্রুকে না যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক।